কেল্লাপাহাড়ের গুপ্তধন

অজেয় রায়

কেল্লাপাহাড়ের গুপ্তধন

০১.

চৈত্র মাস। রতন এসে প্রস্তাব দিল, চল, কেওঞ্ঝরগড় বেড়িয়ে আসি। ছোটকাকার বাড়ি।

রতন ও আমি ছেলেবেলার বন্ধ। ও ভতত্তের ছাত্র, আপাতত গবেষণা করছে। আমার বিষয় প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস। আমিও গবেষণা করছি একটি ফেলোশিপ পেয়ে–প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে।

কেওঞ্ঝর উড়িষ্যার শহর এইটুকুই জানতাম, তার বেশি কিছু না। তাই প্রথমটা একটু গাঁইগুঁই করছিলাম। রতন তাড়া দিয়ে বলল, চ চ, প্রাগৈতিহাসিক! শুনেছি জায়গাটা দারুণ। যাসনি তো কখনও। দুজনেরই খোরাক মিলবে। ওখানে প্রচুর পাহাড়-জঙ্গল। ছোট বড় পুরনো মন্দির আর মূর্তির ছড়াছড়ি। আমিও ধারে-কাছের খনিগুলো দেখে নেব। আর কাকা কাকিমা দুজনেই গ্র্যান্ড লোক, বুঝলি।

দিন কয়েকের মধ্যেই কেওঞ্ঝরগড় গিয়ে হাজির হলাম। রতনের কাকা মিস্টার দত্তকে দেখে প্রথমে একটু ঘাবড়েছিলাম। বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর, লম্বা ভারিক্কি সুপুরুষ চেহারা,

রঙ টকটকে ফরসা। মাথায় কাঁচাপাকা চুল, খুব কম কথা বলেন। নাম করা এনজিনিয়ার।

প্রথম দিন পরিচয় হবার পর আমায় বলেছিলেন, প্রতাপাদিত্য চৌধুরী। বাঃ, বেশ নাম তো তোমার।

কেমন ইতিহাসের গন্ধ আছে, তাই না?রতন পাশ থেকে টিপ্পনী কাটে। মিঃ দত্ত একটু হাসেন। ব্যস, আর কথাবার্তা হয়নি তাঁর সঙ্গে। খুব ব্যস্ত মানুষ, তবে সাদাসিধে।

কাকিমা অবশ্য ভারি আমুদে। আমাদের পেয়ে মহা হৈ-চৈ জুড়ে দিলেন। চট করে জেনে নিলেন, আমি কী কী খেতে ভালবাসি। তিনি খানিক আমাদের সঙ্গে আড্ডা দেন, আর খানিক রান্নাঘরে ঢোকেন। এই চলল তার রুটিন।

আসলে রতনকে এঁরা ভীষণ ভালবাসেন। এঁদের ছেলেপুলে নেই। রতনকে দেখেন ছেলের মতন। রতন সুযোগ পেলেই কাকার কাছে বেড়াতে আসে। তবে এবার এসেছে। অনেক দিন পরে। তাই খাতির-যত্নটা কিঞ্চিৎ বেশি।

.

কেওঞ্ঝরগড় আসার পর দ্বিতীয় দিন সকালে কাকাবাবুর কোয়ার্টারের সামনে লনে পায়চারি করছি আমি ও রতন, এমন সময় হঠাৎ এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন সামনে। শ্যামবর্ণ, নাদুসনুদুস মাঝারি হাইট। গোলগাল হাসি হাসি মুখ, মাথার সামনের দিকে একট টাক। নীল সার্ট ও সাদা ফুলপ্যান্ট পরা। ঝুঁকে পড়ে রতনের হাত আঁকড়ে ঝাঁকিয়ে বললেন–গ্ল্যাড টু মিট ইউ। এরপরই আমার সঙ্গে একদফা হ্যান্ডশেক।

–বস মানে দত্ত সাহেব বললেন, আপনাদের একটু ঘুরিয়ে-টুরিয়ে দেখাতে, হেল্প করতে। তারপর রতনের মুখের পানে তাকিয়ে–আপনি বুঝি দত্ত সাহেবের ভাইপো?, হুঁ ঠিক। চেহারায় ভারি মিল।

এমন হুড়মুড়িয়ে কথা বলছিলেন ভদ্রলোক যে রতন থতমত খেয়ে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি?

আমি? আমি নন্দদুলাল বোস।

ভদ্রলোক আমাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জরিপ করতে করতে বেশ সজোরে বিড়বিড় করে চললেন–হুঁ, পঁচিশ ছাব্বিশের বেশি নয়...এ্যাট লিস্ট দশ বছরের সিনিয়ার হব...অতএব ব্রাদার এবং তুমি! কি, আপত্তি আছে?

খানিকক্ষণ সময় লাগল হেঁয়ালি বোধগম্য হতে। তারপর বলে উঠলাম, না, না, আপত্তির কি? নিশ্চয় তুমি বলবেন। ভদ্রলোক খুশিতে উজ্জ্বল হন। রতন মিটমিটিয়ে দুষ্টু হেসে বলল, আর আমরা যদি ডাকি বোসদা, আপত্তি আছে?

সার্টেনলি নট।

বোসদার সঙ্গে দারুণ জমে গেল। পরে জেনেছিলাম উনি কেওঞ্ঝরগড়ে এসেছেন মাত্র দু-বছর। বিয়ে করেছেন বছর তিনেক, তবে ফ্যামিলি, মানে স্ত্রী, থাকেন দেশের বাড়ি বর্ধমানে। বোসদা এখানে থাকেন একা।

জায়গাটা সত্যি সুন্দর। পুরনো আমলের ছোট্ট শহর। দেশীয় রাজার রাজধানী ছিল। শহরের চারপাশ পাহাড় ও জঙ্গলে ঘেরা। কলকাতা থেকে এসে ভারি আরাম লাগে।

মিস্টার দত্তর গল্প করার ধাত নয়, তবে নজর ঠিক আছে। একদিন চা খাচ্ছি, এমন সময় সামনে এসে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কেমন বেড়াচ্ছ? বোস সব দেখাচ্ছে তো?

বললাম, নতুন আর পুরনো দুটো রাজপ্রাসাদ দেখেছি। এবার জগন্নাথ মন্দির দেখতে যাব। ধারে-কাছে নাকি অনেক প্রাচীন মন্দির আছে?

মিস্টার দত্ত বললেন, আছে বৈকি। উড়িষ্যা হচ্ছে মন্দির আর মূর্তির দেশ। পুরী, কোনারক, ভুবনেশ্বরের কথা ছেড়ে দিলেও আমি ঘুরতে ঘুরতে দেখেছি কত অজানা ছোট্ট গ্রামে কী সুন্দর মন্দির আর বিগ্রহ। মাঠে-ঘাটে পাওয়া যায় কত মূর্তি। বিশেষ করে পাথরে তৈরি! সামান্য দামে লোকে সে সব বেচে দেয়। আমার ড্রইংরুমে যে পাথরের যক্ষমূর্তিটা রয়েছে ওটা এক ওভারসিয়ার আমায় প্রেজেন্ট করেছে। কী সুন্দর না?

.

সেই দিনই গেলাম জগন্নাথ মন্দির দেখতে। কে জানত সেখানে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে এক চমক।

আমি ও রতন মন্দির দেখছি। দেওয়ালের গায়ে মূর্তি দেখতে দেখতে ঊর্ধ্ব মুখে মন্দিরকে পাক দিচ্ছি। ঠিক একই ভাবে আর একজন ঘাড় উঁচু করে এলো উলটো দিক থেকে। তার মুখ দেখতে পাচ্ছি না। রঙ কালো। বেশ লম্বা। কেঁকড়া চুল, সার্ট ও ফুলপ্যান্ট পরনে, জোয়ান চেহারা।

সে মখ ফেরাতেই চমকে রতনকে খোঁচা মারলাম–দেখ, ডাকু।

আগন্তুকের কানে আমার কথা গিয়েছিল। সে পিটপিটিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে দেখল কয়েক সেকেন্ড। তারপর লাফাতে লাফাতে এসে–অ্যাঁ, তোরা? বলে জাপটে ধরল দুজনকে।

উঃ কী গায়ে জোর। দম বন্ধ হবার যোগাড। বলি–ছাড় ছাড। তুই এখানে কোত্থেকে?

ডাকুর সঙ্গে এমন যোগাযোগ হয়ে যাবে ভাবতে পারিনি। ওর সঙ্গে আবার দেখা হওয়ার আশাই মুছে গিয়েছিল মন থেকে। ও ছিল ইস্কলে একটানা পাঁচ বছর ধরে আমাদের দুজনের সহপাঠী। পড়াশুনায় মাঝারি, কিন্তু দারুণ ফুটবল খেলত, আর ডানপিটেমিতে ছিল এক নম্বর ওস্তাদ। ক্লাস নাইনে পড়তে পড়তে ও স্কুল ছেড়ে দেয়। কারণ ওর বাবার আকস্মিক মৃত্যু। তখন ডাকুরা সব ভাইবোন মা-র সঙ্গে কলকাতা ছেড়ে ওদের দেশের বাড়ি মেদিনীপুরে চলে যায়। আর দেখা হয়নি। প্রথমে কয়েকবার চিঠিপত্র লেখালেখি হয়েছে। ক্রমে তাও বন্ধ হয়ে গেছে।

রতন বলল, হ্যাঁ রে তুই আছিস কেমন? এখানে কী করছিস?

ডাকু ম্লানমুখে বলল, আছি এক রকম। টিকে আছি। এখানে এসেছি চাকরি করতে।

কী চাকরি? কদিন হল?

সামান্য চাকরি ভাই। কেরানিগিরি। দুমাস কেওঞ্ঝরগড়ে এসেছি। উড়িষ্যায় আছি পাঁচ বছর। আগে ছিলাম জাজপুরে। এখানে কোম্পানি একটা নতুন ব্রাঞ্চ খুলেছে, তাই ট্রান্সফার হয়ে এসেছি। বুঝলি, স্কুল ফাইনালের পর আর তো লেখাপড়া এগুল না। আমার গাঁয়ের কাছে কলেজ নেই। শহরে হোস্টেলে থেকে পড়া সম্ভব নয়। তাই দেশেই ছিলাম। যা। সামান্য জমিজায়গা আছে, চাষ-বাস দেখতাম। কিন্তু তাতে কি সংসার চলে? তখন আমার এক আত্মীয় এই চাকরিটা জুটিয়ে দিল। মাইনে কম বলে দুঃখ নেই, কিন্তু বসে বসে একঘেয়ে হিসেব কষতে অসহ্য লাগে। ছোটবেলায় ভাবতাম বড় ফুটবলার হব, হল না। ভাগ্যে। স্কুল ফাইনাল পাস করে নেভিতে ঢুকতে চাইলাম, বাড়িতে কান্নাকাটি করে দিলে আটকে। এখন এই করছি।–

বড় কষ্ট হল। জানি তো কী ছটফটে প্রাণশক্তি ভরা দুরন্ত ছেলে ছিল ডাকু। বেচারা।

ডাকু একটু হেসে বলল, তবে একদম ঘেঁতিয়ে যাইনি। সুযোগ পেলেই শিকার করি। বাবার বন্দুকটা আছে। কয়েকটা বড় জানোয়ারও মেরেছি।

তিনজনে ফিরলাম। বোসদা ডাকুর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন, ব্রাদার ইটি

রতন বলল, শ্রীযুক্ত শান্তসুবোধ শাসমল ওরফে ডাকু। আমাদের ইস্কুলের বন্ধ। এখানে চাকরি করে।

ডাকু কেন? বোসদা জানতে চাইল।

অসম্ভব ডানপিটে ছিল কিনা, তাই স্কুলে ওই খেতাব পায়। বলল রতন।

বোসদা ডাকুর দিকে চেয়ে বললেন, হুঁ, চেহারাটা কিঞ্চিৎ গুণ্ডে গুণ্ডো বটে। কিন্তু ব্রাদার, এ ব্যক্তি লোক খারাপ নয়। হাসিটি ভারি মিষ্টি।

আরও দুটো দিন ডাকু আমি আর রতন প্রাণভরে আড্ডা দিলাম। মাঝে মাঝে বোসদাও যোগ দেন। পুরনো দিনের কত গল্প হয়। কত মজার ঘটনা, দুষ্টুমির কথা। কাছাকাছি কী কী দেখতে যাব প্ল্যান করি। এমনি করেই হয়ত আমাদের বাকি দিনকটা কেটে যেত, যদি না রতনের কাকা দেব-বাড়ির মিউজিয়ামের কথা শোনাতেন। কারণ সেই মিউজিয়াম দেখতে গিয়েই আবিষ্কার হল এক রহস্যের সূত্র, যার ফলে জড়িয়ে পড়লাম এক দারুণ রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারে।

.

জাজপুরের কাছে দেবদের প্যালেস। লোকে বলে রাজবাড়ি, তবে ঠিক রাজা নয়–খুব বড় জমিদার, আর খুব পুরনো ফ্যামিলি। এই বাড়িতে দুটো দেখবার জিনিস আছে। এক হল অষ্টধাতুর বিগ্রহ, আরেক হল অস্ত্রশস্ত্রের এক বিরাট সংগ্রহশালা। ছোটকাকা দেবমশাইকে খবর দেওয়াতে তিনি আমাদের সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। বলা বাহুল্য,

ডাকুকেও আমরা সঙ্গে নিলাম। বোসদারও ইচ্ছে ছিল মিউজিয়াম দেখার, কিন্তু গাড়িতে জায়গা কম; তাছাড়া ব-এর সঙ্গে যাওয়াটাও একটু অস্বস্তিকর, তাই তিনি চেপে গেলেন।

খুব ভোরে আমরা রওনা হলাম।

জাজপুর-কেওঞ্ঝর রোড রাস্তাটি ভারি সুন্দর। পিচ বাঁধানো প্রশস্ত সড়ক। আমাদের মোটর চলেছে হু-হুঁ করে। পথের দুপাশে কখনো বিস্তীর্ণ প্রান্তর, কখনো ঝোঁপঝাড়, হালকা জঙ্গল, কখনও বা উঁচু-নিচু বনময় পাহাড়।

ডাকু এ পথে যাতায়াত করেছে। চিনিয়ে দিল–ডানদিকে দূরে ওই যে উঁচু পাহাড়, ওর নাম টোমকা। এরপরে আসবে মহাগিরি রেঞ্জ।

মাঝে মাঝে গ্রাম বা ছোট লোকালয় চোখে পড়ে। পথে রামচন্দ্রপুরে একবার থেমেছিলাম আড়মোড়া ভাঙতে। রামচন্দ্রপুর নাকি পুলিশ স্টেশন। কিন্তু ছোট্ট লোকালয়। দেব-বাড়ি পৌঁছলাম বেলা দশটা নাগাদ।

জাজপুর-কেওর স্টেশন রোড ছাড়িয়ে, পিচ রাস্তা থেকে বেরিয়ে যাওয়া একটা চওড়া মেঠো রাস্তা ধরে মাইল দুই ঢুকে এক গ্রামে পৌঁছলাম। দেখে মনে হয় এককালে বেশ বর্ধিষ্ণু ছিল এই গ্রাম। গাছপালার আড়াল থেকে সহসা জেগে উঠল উঁচু পাঁচিলে ঘেরা

এক প্রকাণ্ড দোতলা অট্টালিকা। লক্ষ করলাম, অট্টালিকার কয়েকটি অংশ খুবই জীর্ণ। বাড়ির চার পাশে পরিখা কাটা ছিল, এখন বুজে গেছে।

ভিতরে খবর পাঠানো হল।

.

বাব খগেশ্বর দেব মহাশয় স্বয়ং বেরিয়ে এলেন আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে। সৌম্যকান্তি দীর্ঘকায় বৃদ্ধ। গায়ের রঙ টক্টকে, মাথা জোড়া টাক, নাকটি টিয়াপাখির মতন। বয়সের ভারে শরীর সামান্য নুইয়ে পড়েছে সামনে।

কাকাবাবু বললেন একদম সময় পাই না বলে আসা হয়নি অ্যাদ্দিন। তবে মিউজিয়াম দেখার ইচ্ছে ছিল খুবই। এবার এরা ধরল, তাই এসে পড়লাম।

কাকাবাবু আমাদের পরিচয় দিলেন। বৃদ্ধ হাসিমুখে বললেন, আপনারা এসেছেন, আমার সৌভাগ্য। চলুন ভিতরে।

বৈঠকখানায় বসে একপ্রস্থ চা-জলখাবার হল। তারপর আমরা খগেশ্বর বাবুর পিছনে পিছনে চললাম মিউজিয়াম দেখতে। আমাদের পিছনে আসছে একজন ভৃত্য। তার হাতে একটা জ্বলন্ত পেট্রোম্যাক্স আলো। দেবমশাইয়ের হাতে এক পেল্লায় চাবি।

বারান্দার প্রান্তে এক দরজার সামনে থামলেন খগেশ্বরবাবু। দরজায় বিশাল এক তাল ঝলছে। ঝনাৎ করে তালা খুললেন দেবমশাই তারপর ধাক্কা মেরে দরজা ফাঁক করে দিলেন। এবার তিনি পেট্রোম্যাক্সটা চাকরের কাছ থেকে নিজের হাতে নিয়ে ধীর পায়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন। পিছনে আমরা চারজন। ভৃত্যটি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

লম্বা হলঘর, উঁচু ছাদ, ভিতরে ভ্যাপসা অন্ধকার। বোধহয় অনেক দিন খোলা হয়ান ঘর। পেট্রোম্যাক্সের তীব্র আলোয় চমকে গিয়ে কয়েকটা চামচিকে আমাদের মাথার ওপর ঘুরপাক খেতে লাগল।

চতুর্দিকে দেওয়াল জুড়ে টাঙানো অজস্র অস্ত্র আর অস্ত্র। দেওয়াল ঘেঁষে লম্বা লম্বা কাঠের টেবিল পাতা। টেবিলগুলোর ওপরেও সাজানো বিচিত্র অস্ত্রের সম্ভার। ছুরি, ছোরা, তরবারি, ঢাল, বর্শা, বল্লম, টাঙ্গি, দাও, কুঠার, গদা, তীর-ধনুক, শিরস্ত্রাণ, বর্ম...। কত কী। ধাতু, কাঠ, হাড় প্রভৃতিতে তৈরি। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা ছোট কামান মখ উচ করে বসানো।

এ সবই পুরনো আমলের অস্ত্রশস্ত্র। এমন বিপুল সংগ্রহ দেখব ভাবতে পারিনি। আলো পড়ে ধাতুর অংশগুলি চকচক করে উঠল।

খগেশ্বরবাবু একটা টুলের ওপর আলোটা রাখলেন। বৃদ্ধের শরীর টান টান হয়ে উঠল। চক্ষু উজ্জ্বল। গম্ভীরস্বরে বললেন, আমার পূর্বপুরুষ ক্ষাত্রধর্মের চর্চা করতেন। যুদ্ধ ও শিকার। বাহুবলের সাহায্যে তাঁরা ধনসম্পত্তি উপার্জন করেছিলেন। এই সব অস্ত্রের অধিকাংশই আমাদের বংশের কেউ না কেউ ব্যবহার করেছেন। সবই কিন্তু সেই অতীতে। বহু স্মৃতি ও ইতিহাস জড়িয়ে আছে এই অস্ত্রগুলির সঙ্গে। দেব বংশে অস্ত্রচর্চা আর হয় না, জমিদারিও আর নেই। আমার ছেলে নাতিরা বন্দুক টলুক বিশেষ পছন্দ করেন না। আসেও খুব কম। আমি বুড়ো মানুষ এই শূন্যপুরী আগলাচ্ছি। জানি না আমার পরে এ বাড়ির কী হাল হবে।

তার কণ্ঠে সাময়িকভাবে একটা বিষণ্ণতার সুর ধরা পড়ে। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার স্বাভাবিক সুর ফিরে আসে, আর উৎসাহ ভরে তিনি আমাদের সব কিছু দেখাতে থাকেন।

চমৎকার বর্ণনা দেওয়ার ক্ষমতা ভদ্রলোকের। আমরা মাঝে মাঝে প্রশ্ন করি, কখনো বা কোনো জিনিস হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখি।

হঠাৎ ডাকু একটা ছুরি তুলে নিয়ে মন দিয়ে দেখতে লাগল। ব্যাপারটা খগেশ্বরবাবু লক্ষ করেছিলেন। বললেন, ওটা হানটিং নাইফ। দেশি কারিগরের তৈরি। খুব মজবুত জিনিস।

এটা কতদিন আছে এখানে? ডাকু প্রশ্ন করল।

তা অনেক দিন। আমার বাবা ছোটবেলা থেকে এটা দেখেছেন। কে এটা এনেছিল জানি না।

এই পদ্মফুলটা কেন খোদাই করেছে বাঁটে? জিজ্ঞেস করল ডাক।

কি পদ্মফুল? আমি ও রতন এবার কাছে গিয়ে ছুরিটা দেখি।

বাঁটসুদ্ধ প্রায় এক ফুট লম্বা ছুরিখানা। চওড়া ফলা। হাতির দাঁতের বাঁট। বাঁটের ওপর একটা সুন্দর ছোট পদ্মফুলের নকশা খোদাই করা।

দেবমশাই ডাকুর হাত থেকে ছুরিটা নিয়ে কারুকার্যটি দেখলেন। তারপর বললেন, খেয়াল-খুশিমতো নকশা করেছে হয়তো। কিংবা কারিগরের নিজস্ব ছাপ হতে পারে, মানে ট্রেডমার্ক।

ও। ডাকু ছুরি রেখে দিল একটু অন্যমনস্কভাবে।

ওই সামান্য ছুরি সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ আগ্রহ ছিল না। কত বড় বড় অদ্ভুত আকৃতির অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে, সেগুলোর ওপরই আমাদের বেশি নজর।

ঘণ্টা দুই পর আমাদের মিউজিয়াম দেখা শেষ হল। ঘর থেকে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় কাকাবাবু বললেন, দেবমশাই আপনাদের মন্দিরের বিগ্রহটি একবার দেখাবেন? খুব নাম শুনেছি।

দেবমশাই থমকে দাঁড়ালেন। তার মুখ বিমর্ষ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে বললেন, খবরটা বোধহয় আপনাদের ওদিকে পৌঁছায়নি এখনো। সমস্ত অলংকার সমেত আমাদের বিগ্রহটি চুরি গেছে।

সে কী? কবে? কাকা বলে উঠলেন। আমরাও অবাক।

মাত্র দ-দিন আগে। চুরি নয়, ডাকাতি। চার-পাঁচজন লোক এসেছিল রাতে। মিন্দরের প্রহরীকে অতর্কিতে আঘাত করে বেঁধে ফেলে, মন্দিরের দরজা ভেঙে ঢুকে ভিতরের যাবতীয় দামি জিনিস লট করেছে। গৃহ-দেবতা বিগ্রহ হারিয়েই বেশি কষ্ট পেয়েছি। পুলিশ অনুসন্ধান করছে। তিন হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছি শুধু বিগ্রহের জন্যে। এখন ভাগ্য।

তিন হাজার টাকা, শুধু বিগ্রহের জন্যে? ডাকু চোখ বড় বড় করে বলে।

হ্যাঁ। যদি কেউ উদ্ধার করে দেয়। গৃহ-দেবতাকে ফিরে পাওয়াই আমার সবচেয়ে বং কামনা।

আমরা মনে মনে লজ্জিত হলাম। সত্যি, ভদ্রলোক একবারও বুঝতে দেনান যে এত মন খারাপ। দিব্যি হাসিমুখে সব দেখালেন।

মিস্টার দত্ত বললেন, ছি ছি, এখন আপনাকে বিরক্ত করা উচিত হয়নি। জানতাম না কিছু।

ভদ্রলোক যদিও কথাটা উড়িয়ে দিলেন, আমরা তার মনের আসল ভাবটা আন্দাজ করে তাঁকে আর বিরক্ত না করে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম।

.

০২.

শহরে পৌঁছে আমরা ডাকুর বাড়িতে নামলাম, কাকাবাবু গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন। খিদেটা পেয়েছিল বেশ চনচনে, তাই দোকান থেকে চা আর গরম আলুর চপ আনিয়ে জমিয়ে বসলাম।

একটা বড় বাড়ির একতলায় একটা মাঝারি সাইজের ঘর নিয়ে ডাকু থাকে। আমরা দুজন সতরঞ্চি বিছানো তক্তপোশে বসেছি, ডাকু একটা হাতল-ভাঙা কাঠের চেয়ারে।

গরম চপে একটা বেপরোয়া কামড় দিয়ে মুখটাকে একটু বিকৃত করে ডাকু হঠাৎ বলল, কোনো মানে হয় না।

কীসের কোনো মানে হয় না? রতন জিজ্ঞেস করল।

তিন হাজার টাকা। পুলিশ তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। তারা যদি বামাল সমেত চোর ধরে ফেলে তাহলে তো টাকাটা মাঠে মারা যাবে।

আমি বললাম, তাই বলে তুই পুলিশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তদন্ত শুরু করবার তাল করছিস নাকি? তিন হাজার টাকা কি সকলের কপালে থাকে রে? তাও যদি বা কোনো ক থাকত।

আমার ইচ্ছে ছিল যেখানে বিগ্রহটা ছিল সে জায়গাটা একবার দেখে আসি। তোরা এমন তাড়াহুড়ো করে চলে এলি!

ভালো কথা,–রতন বলে উঠল–তোর হঠাৎ ওই ছুরিটার ওপর চোখ গেল কেন?

ঠিক ও-রকম একটা ছুরি একবার আমার প্রায় হাতে এসে গেসল, তাই।

ডাকু বেপরোয়া ডানপিটে হতে পারে, কিন্তু বাজে গুল মারার অভ্যাস নেই সেটা আমরা জানি। কাজেই কথাটা শুনে আমরা দুজনেই বেশ অবাক। বললাম, কী ব্যাপার একটু খুলে বলতো।

ডাকুর কথা থেকে যা বেরোল তা মোটামুটি এই–

বছর দুয়েক আগে বর্ষার মুখটাতে ডাকু একা মহাগিরি রেঞ্জে শিকার করতে গিয়েছিল। শিকার শেষে পাহাড় থেকে হেঁটে ফিরছিল রামচন্দ্রপুরে বাস ধরবে বলে। পথে বৃষ্টি নামে, ডাকু দৌড়ে গিয়ে কাছের একটা গ্রামে এক বুড়োর ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সে বুড়ো নাকি কামার, এবং ভারি ভাল লোক! সেই বুড়োর ঘরের দেয়ালে ঝোলানো একটা ছুরির ওপর ডাকুর চোখ যায়। দেবদের অস্ত্রাগারে দেখা পদ্মমার্কা ছুরির প্রায় ডুপ্লিকেট। সেই রকম সাইজ, সেই রকম ফলা কেবল হাতির দাঁতের বদলে কাঠের হাতল। কিন্তু হাতলে অবিকল সেই রকম পদ্মচিহ্ন। ডাকু নাকি ছোরাটা অনেক করে কিনতে চেয়েছিল, কিন্তু বুড়ো কামার রাজি হয়নি। সে বলেছিল যে এই ছুরির ফলার ইস্পাত লোহার সঙ্গে এক রকম বিশেষ। ধাতু মিশিয়ে তৈরি করেছে, এবং এই মেশাবার কায়দা নাকি ওই বুড়ো কামারেরই এক পূর্বপুরুষ দৈবাৎ আবিষ্কার করে। এই সব ইস্পাতের জিনিস আগে বুড়োর পূর্বপুরুষরা বানাত, রাজা জমিদার, সেনাপতি–এই সব বড়লোকদের জন্য। এখন এ সবের কদর নেই, চাহিদা নেই, তাই বানানো প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। ওই একটি ছুরি তাই অতি যত্নে রেখে দিয়েছে কামার।

ডাকুর এই বর্ণনা আমাদের দুজনেরই কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছিল–অবিশ্যি সেটা দুটো আলাদা কারণে। ডাকু থামলে পর আমিই প্রথম প্রশ্ন করলাম।

গ্রামের নামটা মনে আছে তোর? বাঃ, মনে থাকবে না? ডাকু বেশ জোরের সঙ্গেই বলে উঠল কথাটা–জগন্নাথপুর। কেন, তোর কি যাবার শখ হয়েছে? ও ছুরি দেবে না বুড়ো।

আমি ডাকুর কথা অগ্রাহ্য করে আরেকটা প্রশ্ন করলাম–আর বুড়ো কামারের নাম?

বংশীধর পাত্র। আরো কিছু জানতে চাস?

না, জানতে চাই না। যেতে চাই জগন্নাথপুর। তবে ছুরি হাত করতে নয়। ছুরিটা কীভাবে বানিয়েছিল বংশীধর পাত্র, সেটা জানতে। ভারতীয় ইস্পাত একদিন পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। শুধু তাই নয়–ইস্পাত তৈরির কৌশল প্রথমে ভারতেই আবিষ্কার হয়। অনেকে বলেন, ভারতীয় ইস্পাতের সাহায্যেই প্রাচীন মিশরীয়রা তাদের কঠিন পাথরের মন্দিরের গায়ে চিত্রলিপি ও মূর্তি খোদাই করেছিল। প্রাচীন যুগের কথা ছেড়ে দিলেও–ধর, এই একশো বছর আগেও সিপাই বিদ্রোহের পর সিপাইদের কাছ থেকে যে সব ছুরি, তলোয়ার ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলো পরীক্ষা করে ইংরেজরা অবাক হয়ে যায়। শেষে কলকারখানার যুগ আরম্ভ হওয়ায় এই সব কামাররা মার খেয়ে যায়। কিন্তু এই সব কামারদের মধ্যে একজনেরও যদি সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তাহলে তার কাছ থেকে ইস্পাত তৈরির আশ্চর্য সব তথ্য পাওয়া যেতে পারে। বল ডাকু–জগন্নাথপুর নিয়ে যাবি?

এবার রতন আমার প্রস্তাবে যোগ দিল। সে বলল, আমারও যাওয়া দরকার, কারণ আমারও বংশী কামারের সঙ্গে দরকার আছে। প্রতাপের কৌতূহল ঐতিহাসিক হিসাবে, আমার কৌতূহলটা জিওলজিস্টের। আমি জানতে চাই বংশী লোহার সঙ্গে কী ধাতু মিশিয়ে ইস্পাত তৈরি করে, এবং কোত্থেকে সে এই ধাতু পায়।

ডাকু ভেবে বলল, বেশ, পরশু চল জগন্নাথপর। কীসে যাবি? বাসে, না প্রাইভেট গাড়িতে?

বাসে নয়, বলল রতন, কাকার গাড়িটা আমি ম্যানেজ করব।

.

রামচন্দ্রপুর ছাড়িয়ে কিছুটা গিয়ে বাঁ-ধারে মাইলখানেক দূরে জগন্নাথপুর গ্রাম। পিচ রাস্তা থেকে একটা গোরুর গাড়ি চলার মেঠো রাস্তা চলে গেছে গ্রামের দিকে। ওপথে মোটর যাবে না। তাই ঠিক হল, ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে বড় রাস্তার ধারে অপেক্ষা করুক।

আমরা পায়ে হেঁটে চললাম গ্রামে।

গ্রামের সীমানায় আমাদের অভ্যর্থনা জানাল এক দঙ্গল ছোট ছেলেমেয়ে। সর্বাঙ্গে ধুলো। বিস্ফারিত দৃষ্টি। নির্বাক অভ্যর্থনা।

ডাকু বলল, সোজা চল, একটা বড় বটগাছের ধারে বংশীর ঘর।

রাস্তার পাশে এক বাড়ির দাওয়ায় কয়েকজন লোক বসে ছিল। তারা হাঁ করে আমাদের দেখতে লাগল। বটগাছ দেখলাম! সত্যি বিরাট। ডাল থেকে প্রচুর ঝুরি নেমেছে মাটিতে। যেন জটাজুটধারী মুনি একজন। গাছের ধারে ধারে কয়েকটি কুটির। ডাকু দেখাল, ওইটে বংশীর বাড়ি।

দুঃখের বিষয়, বাড়ির দরজায় তালা ঝুলছে। বুঝলাম বংশী কোথাও বেরিয়েছে। এদিক সেদিক চাইতে দেখি পাশের বাড়ির দরজা দিয়ে একটা মুখ উঁকি মারছে। ডাকু ডাকল তাকে–শুনুন। লোকটি যেন ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে এল। অস্থিচর্মসার ছোটখাটো মানুষটি। বয়স বোঝা ভার। ডাকু জিজ্ঞেস করল, বংশী নেই দেখছি। কখন আসবে বলতে পারেন?

লোকটি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমাদের লক্ষ করছিল। এবার সে যে প্রশ্নটি ছাড়ল, তার জন্য আমরা একেবারে প্রস্তুত ছিলাম না। তীব্র খ্যানখ্যানে গলায়–আজ্ঞে আপনারা কি পুলিশের লোক?

সে কি! আমাদের পুলিশ ঠাওরাবার কারণ?

রতন বলল, না আমরা পুলিশ নই। বংশীর কাছে এসেছি একটা কাজে। একটা লোহার জিনিস গড়াব, তাই।

ও। লোকটি যেন হাঁফ ছাড়ল। সে কাছে এগিয়ে এল।

তা আপনারা আসছেন কোত্থেকে?

ডাকু বলল, কেওঞ্ঝরগড়। আমি ওখানেই থাকি। এঁরা দুজন কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছেন। বংশীর খুব প্রশংসা শুনেছেন, তাই তার কাজ দেখতে চান।

অ্যাঁ কলিকাতার লোক? লোকটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আজ্ঞে আমিও কলিকাতা ছিলাম চার বছর। হোটেলে কাজ করতাম। অসুখে ভুগলাম খুব তাই দেশে চলে এসেছি ছয় মাস হল। লোকটি এতক্ষণ ওড়িয়ায় কথা বলছিল। এবার সে বাংলা-ওডিয়ার জগাখিচুড়ি ছাড়ে। বলল, আজ্ঞে আমার নাম কার্তিকচন্দ্র পণ্ডা। তা বংশীদাকে খোঁজ করছিলেন কিনা তাই ভাবিলাম আবার বুঝি পুলিশ এসেছে।

ডাকু বলল, বংশীর কাছে বুঝি পুলিশ এসেছিল?

হ্যাঁ।

কেন?

আর বলবেন না মশাই। গতকাল পুলিশ এসেছিল পঞ্চার খোঁজে! বংশীদাকে কি হয়রানিটাই না করল।

পঞ্চা কে? আমি জিজ্ঞেস করি।

বংশীদার ছেলে। ইস অমন ভালো মানুষটা! ছেলের জন্যে মান-ইজ্জত সব গেল।

ডাকু বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ–বংশীর এক ছেলে আছে, বলেছিল সেদিন। তা পঞ্চা কী করেছে?

ডাকাতি মশায়!কার্তিক গলার স্বর একটু নামায়।দেব-বাড়ির ডাকাতির কেসে পুলিশ ওকে খুঁজছে। এ নাকি ওর দলের কাজ। দেব-বাড়ির মন্দির ভেঙে ভীষণ ডাকাতি হয়েছে। সাংঘাতিক ছেলে মশাই পঞ্চা। গুণ্ডা বদমাশ। আগে একবার মাস দুই জেলও খেটেছে। এবার ধরা পড়ে সারাজীবন জেলের ঘানি টানুক। শিক্ষে হোক বেটার।

দেব-বাড়ির ডাকাতি ও বংশীর ছেলে!–এ তো অদ্ভুত যোগাযোগ। আমি বললাম, বংশীর ছেলে বুঝি লোহার কাজ করত না?

কেন করবে না, বলল কার্তিক, আগে করত। বেশ কাজ শিখেছিল। তারপর কুসঙ্গে, পড়ে নষ্ট হয়ে গেল। বংশীদা ওকে কত বুঝিয়েছে। বকেছে! কিন্তু ও ছেলে কি শোনার পাত্র। নেহাত মা-মরা একমাত্র ছেলে, নইলে বাড়িতেই ঢুকতে দিত না বংশীদা। এখন আট-দশ দিন পঞ্চা হাওয়া। তারপর কাল এল পুলিশ।

পঞ্চার কথা শুনতে আমার উৎসাহ হচ্ছিল না। বংশী কখন আসবে? কার্তিক জানাল, ভোর থেকেই দেখছি বংশীদার ঘরে তালা মারা। কোথায় গেছে, কখন আসবে হয়তো পেল্লাদ বলতে পারে।

কে পেল্লাদ?

আজ্ঞে বংশীদার অ্যাসিস্টান্ট। ভারি ভাল ছেলে।

পেল্লাদের সঙ্গে একবার দেখা করা যাবে? বললাম আমি।

নিশ্চয়। পেল্লাদ এ গাঁয়েই থাকে।–ওরে এই ছোঁড়া। যা তো পেল্লাদকে ডেকে নিয়ে আয়। বল কলিকাতার বাবুরা ডাকছেন। কার্তিক একটা ছোট ছেলেকে পাঠিয়ে দিল।

আমি লক্ষ করেছিলাম বটতলায় অনেকগুলো উনুন। ওগুলো লোহা গালাবার চুল্লি। সবই ভাঙা। শুধু একটা আস্ত আছে। চুল্লি শক্ত মাটিতে তৈরি। তলাটা গোল। প্রায় তিন ফুট ব্যাস। তলা থেকে ওপরে গম্বুজের মতো সরু হয়ে গেছে। চুল্লির তলায় দুটো ফুটো! মাথাতেও ফুটো। রতনকে দেখিয়ে বললাম–

এই হচ্ছে দেশি কামারদের আদিম চুল্লি। অবশ্য এর চেয়ে ছোট বা বড়ও হয়। তলার একটা ফুটো দিয়ে গলানো লোহার খাদ বেরিয়ে যায়। অন্য ফুটোটা দিয়ে চামড়ার হাপর চালিয়ে পাম্প করে হাওয়া ঢোকানো হয়, আগুনের তাত তোলার জন্য। আর মাথার ফুটো দিয়ে লোহার আকর এবং কাঠকয়লা ফেলা হয় চুল্লির ভিতর জ্বলন্ত কাঠের ওপর। কয়েক ঘণ্টা প্রচণ্ড আঁচে লোহা-পাথর গলে যায়। তখন ভারী ধাতু লোহা নিচে জমা হয় এবং ওই পাথরে মেশা অন্য ধাতু বা খাদ ওপরে ভাসতে থাকে। সেগুলো বেরিয়ে যায় ফুটো দিয়ে। তারপর গলিত লৌহপিণ্ড বের করে হাতুড়ি দিয়ে বেশ করে পেটালে বাকি খাদ ঝরে গিয়ে থাকে প্রায় বিশুদ্ধ লৌহপিণ্ড। আর ইস্পাত বানাতে হলে ওই রকম খাঁটি লোহাকে আবার গলিয়ে তার সঙ্গে মেশানো হয় গুঁড়ো কাঠকয়লা অর্থাৎ কার্বন, তৈরি হয় কার্বন-স্টিল।

মনের আনন্দে লেকচার দিচ্ছিলাম। হঠাৎ খেয়াল হল, রতন শুনছে না। সে ডাকুকে লক্ষ করছে। ডাকু দেখি কার্তিকের সঙ্গে বংশীর উঠানে বেড়াচ্ছে। একবার কানে এল পঞ্চার নাম। ওর মাথায় দেব-বাড়ির ডাকাতি ঘুরছে নাকি?

এই যে পেল্লাদ এসেছে। কার্তিক ডাকল, আয় আয়।

কার্তিক কুড়ি বাইশ বছরের একটি যুবককে আমাদের সামনে হাজির করল। যুবকের স্বাস্থ্য ভালো। শান্ত মুখশ্রী। কঁচুমাচু ভাবে এসে দাঁড়াল প্রহ্লাদ।

আমি বললাম, তুমি বংশীর সঙ্গে কাজ করো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমি এবার প্রহ্লাদকে বললাম, বংশীর লোহার কাজের খুব নাম শুনেছি, তাই এসেছিলাম দেখতে। কিছু জিনিস গড়াতে। তা বংশী গেছে কোথায়, জানো?

প্রহ্লাদ আমতা আমতা করে বলল, এখনও ফেরেনি বংশীজ্যাঠা। হয়তো কেল্লাপাহাড়ে গেছে। তবে তো ফিরতে দেরি হবে।

ডাকু বলল, কেল্লাপাহাড়? সে কোথায়?

ওই দিকে একটা ছোট পাহাড় আছে। প্রহ্লাদ পশ্চিমে মহাগিরি রেঞ্জের দিকে দেখায়। সেই পাহাড়ের মাথায় আছে একটা পুরনো ভাঙা কেল্লা। ওই পাহাড়কে আমরা বলি

কেল্লাপাহাড়। এখান থেকে তিনক্রোশ পথ। পলাশবুনি গাঁয়ের পাশ দিয়ে যেতে হয়। বংশীজ্যাঠা মাঝে মাঝে যায় ওই পাহাড়ে।

কেন?

জ্যাঠা বলে ওই পাহাড়ে নাকি তার পূর্বপুরুষ থাকত, তাই দেখতে যায়। আর–প্রহ্লাদ হঠাৎ চুপ করে গেল।

আর কী? জিজ্ঞেস করলাম।

প্রহ্লাদ একটু ইতস্তত করে বলল, আর বংশীজ্যাঠা পাহাড় থেকে এক রকম পাথর আনে।

রতন বলল, পাথর? কী পাথর?

সে পাথর আমি চিনি না। একবার মাত্র দেখেছি।

লোহা-পাথর?

না। প্রহ্লাদ ঘাড় নাড়ে।

ওই পাথর দিয়ে কী করে বংশী? বলল রতন।

ঠিক জানি না। তবে মনে হয় লোহার সঙ্গে মেশায়। তবে কীভাবে মেশায় দেখায়নি কখনো। প্রহ্লাদ উত্তর দেয়।

হন গেছো কখনো ওই পাহাড়ে পাথর আনতে? রতন জানতে চায়।

না। আমি কখনো যাইনি কেল্লাপাহাড়ে। বলল প্রহ্লাদ।

বংশীর ছেলে গেছে? এবার ডাকুর প্রশ্ন।

হ্যাঁ তা গেছে। আমি যাইনি।

সেই পাথর আছে এখানে? দেখাতে পারো। রতন বলে।

এত প্রশ্নের মুখে প্রহাদ কেমন ঘাবড়ে যায়। আড়ষ্টভাবে বলে, না নেই। কাজ হয়ে গেলে বংশজ্যাঠা ওই পাথরের টুকরো দূরে ফেলে দিত। বেশি পাথর তো আনত না। শেষবাব এনেছিল বছরখানেক আগে। আর যায়নি। প্রহ্লাদ জানাল, কেল্লাপাহাড়ে গেলে বংশীজ্যাঠার ফিরতে রাত হয়ে যায়।

আরও ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করলাম। নাঃ, বংশী এখন ফিরবে না। অগত্যা আর একদিন আসব বলে বাড়িমুখো রওনা দিলাম। মন খারাপ। আজকের অভিযান ব্যর্থ হল! ডাকু রতনও চুপচাপ।

মাত্র মাইল দুই গেছি। হঠাৎ দুম! মোটরের টায়ার ফাটল।

কী ঝামেলা। বাড়তি টায়ার অবশ্য আছে সঙ্গে। আমরা নামলাম। ডাইভার নতুন টায়ার লাগানোর তোড়জোড় করে। জায়গাটার বাঁ-পাশে পথের ধারেই এক ছোট পাহাড়।

ডাকু বলল, চ, ততক্ষণ পাহাড়ে বেড়িয়ে আসি।

উত্তম প্রস্তাব। ডাকু বন্দুক নেয়–যদি বনমোরগ পাওয়া যায় শিকার করব।

পাহাড়ে উঠছি। এদিক সেদিক ঘুরছি। এক জায়গায় পাহাড়ের ঢাল খাড়া নেমে গেছে অনেকখানি। আমি কিনারে গিয়ে নিচে তাকাতেই চমকে উঠলাম।

সোজা নিচে পাহাড়ের ওপর একটি মানুষের দেহ পড়ে আছে চিৎ হয়ে। কয়েক সেকেণ্ড, লক্ষ করে বুঝলাম–নিশ্চল। তার দেহের অদ্ভুত-ভঙ্গি দেখে সন্দেহ হল মরে গেছে নাকি?

বতন ও ডাকুকে দেখালাম। তারপর তাড়াতাড়ি নেমে গেলাম ঘুরে। কাছাকাছি গিয়েও ডাক প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে–একি, এ যে বংশী!

.

০৩.

বংশী মারা গেছে সন্দেহ নেই। মাথার চুলে চাপ চাপ রক্ত জমাট বাঁধা। খুলির এক জায়গা হাঁ হয়ে গেছে। আর কোনো আঘাতের চিহ্নই নেই দেহে। বোঝা যায় বংশীর মৃত্যু হয়েছে। অনেকক্ষণ।

কিন্তু মরলো কী করে?

ডাকু বলল, খাদের ওপর থেকে পড়ে গিয়েছিল। এ ছাড়া আর তো কোনো কারণ মনে। হচ্ছে না। কিন্তু পড়ল কেন? এরা পাহাড়ে চড়তে অভ্যস্ত। সহজে তো পা ফসকায় না। তবে মদ খেয়ে মাতাল হলে বেসামাল হতে পারে। হয়তো খাদের ধারে ধারে যাচ্ছিল কিংবা ঢালের গায়ে ওই মহুয়া গাছটায় চড়েছিল পাকা মহুয়ার লোভে, তারপর বেটাল হয়ে পড়ে গেছে। ইস, কী স্যাড় ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত বংশীর সঙ্গে এভাবে দেখা হবে, কে জানত।

বংশীর মৃতদেহের পাশেই একটি ছোট ঝুলি পড়েছিল। রতন সেটা তুলে দেখল। ভিতরে একটা হাতুড়ি। মাটিতে ছেনি বাটালি ইত্যাদি কয়েকটা জিনিস ছড়িয়ে পড়ে আছে। রতন সহসা কী একটা কুড়িয়ে নিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, ডাকু এই দেখ।

রতনের হাতে একটা ছুরি। কাঠের খাপে পোরা। কাঠের হাতলে খোদাই করা পদ্ম। ঠিক মিউজিয়ামের ছুরির মত।

ডাকু খাপ থেকে ছুরি টেনে বার করল। ছুরির ফলা একটু বাঁকানো। বলল, এই সেই ছুরি। দু-বছর আগে এটাই আমি দেখেছিলাম বংশীর কাছে। বংশী ছুরিটা সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিল আজ।

রতন ছুরিটা চেয়ে নিল ডাকুর কাছ থেকে। তারপর গম্ভীরভাবে বলে, এ ছুরি আমি নিলাম।

সে কি! আমরা অবাক।

রতন বলল, হ্যাঁ। কারণ এ ছরিতে বংশীর আর কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমার আছে। বংশী কী ধাতু মেশাত এই ইস্পাত বানাতে তা বংশীর মুখে থেকে আর কেউ কোনোদিন জানতে পারবে না। তাই ছরিটা নিচ্ছি; অ্যানালিসিস করে দেখতে চাই, কী কী আছে এতে।

রতন এমন দৃঢ়স্বরে বলল কথাগুলো যে আমরা আর প্রতিবাদ করতে পারলাম না। এদিকে মৃতদেহের ব্যবস্থা করা দরকার। বংশীর গ্রামে খবর দিতে হবে। রতন বলল, ডাকু, তুই জগন্নাথপুর চলে যা। গাড়ির টায়ার নিশ্চয় এতক্ষণে বদলানো হয়ে গেছে। আমি আর প্রতাপ থাকছি এখানে।

ডাকু চলে গেল। একটু পরেই মোটরের ইনজিনের আওয়াজ পেলাম।

ডাকু প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এল, সঙ্গে ছ-সাত জন গ্রামের লোক। কার্তিকও এসেছে। কার্তিক তো হাউমাউ করে একচোট কান্না জুড়ে দিল প্রাণহীন বংশীকে দেখে। যাহোক ওরা চটপট গাছের ডাল দিয়ে একটা মাচা বানিয়ে তার ওপর বংশীর দেহ চাপিয়ে নিয়ে গ্রামের দিকে চলে গেল। আমরাও ফিরলাম কেওঞ্ঝরগড়।

.

কেওঞ্ঝরগড়ে পৌঁছবার পরদিনই রতন ছুরিটা পাঠিয়ে দিয়েছিল ধাতুবিদ ডক্টর ত্রিপাঠীর কাছে অ্যানালিসিসের জন্যে। পাঁচদিন পরে ডক্টর ত্রিপাঠী রতনকে ফোন করলেন।

অ্যানালিসিস্ হয়ে গেছে। বিকেলে আসুন।

আমি ও রতন গেলাম।

ডক্টর ত্রিপাঠী সাহেবি কেতার মানুষ। ছোটখাটো শীর্ণকায়, ফরসা। মুখে সর্বদা পাইপ। আমরা বসতেই কফির অর্ডার দিয়ে বললেন, এ ছুরি কোত্থেকে পেয়েছেন?

রতন বলল, একজন দেশি কামারের কাছ থেকে।

স্ট্রেঞ্জ। ত্রিপাঠী বিস্ময় প্রকাশ করেন। আমি জানতাম দেশি কামার বড়জোর কার্বনস্টিল তৈরি করতে পারে। কিন্তু লোহার সঙ্গে অন্য ধাতু মেশায়, এই প্রথম জানলাম।

কেন, কী কী পেয়েছেন? রতন উত্তেজিত।

পেয়েছি অনেক কিছু। খুব ভালো কোয়ালিটির স্টিল। এতে আছে প্রায় টেন পারসেন্ট ক্রোম, ওয়ান পারসেন্ট নিকেল, সামান্য ম্যাঙ্গানিজ। কার্বন, সিলিকন ইত্যাদি। এবং বাকিটা আয়রন।

ক্রোম, নিকেল! ত্রিপাঠীর কথা শেষ না হতেই রতন চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে।

তার মানে বংশী ক্রোম আর নিকেল মেশাত লোহার সঙ্গে।

কে বংশী? ত্রিপাঠী জিজ্ঞেস করলেন।

ওই কামারের নাম, যে ছুরি তৈরি করেছে। বলল রতন।

সে কোথায় থাকে?

রামচন্দ্রপুরের কাছে এক গ্রামে। কিন্তু সে নেই। মারা গেছে।

বংশী ক্রোম আর নিকেল পেত কোত্থেকে? জানেন আপনি?

ত্রিপাঠী ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করেন।

সঠিক জানি না। আন্দাজ করছি। রতন থতমত খেয়ে বলে, খবর পেয়েছি, বংশ মহাগিরি রেঞ্জের এক পাহাড় থেকে কিছু ধাতু পাথর আনত গোপনে। সেই পাথর লোহার সঙ্গে মেশাত। আমার ধারণা ওই পাহাড়ে ক্রোম আর নিকেলের ডিপোজিট আছে। হয়তো একই জায়গায়। কাছাকাছি। বংশী নিশ্চয় এই দু-রকম পাথরই আনত। এই রকম ইস্পাত বানাবার কায়দা ওর এক পূর্বপুরুষ নাকি আবিষ্কার করেছিল। অবশ্য কোন ধাতুর কী গুণ আলাদা করে নিশ্চয় তারা বুঝত না। আপনি কী বলেন?

বুঝলাম রতন ত্রিপাঠীর কাছে কেল্লাপাহাড় বা জগন্নাথপুরের নাম চেপে যেতে চায়।

ত্রিপাঠী কয়েক সেকেণ্ড ভেবে বললেন, হয়তো ক্রোম আনত–কিন্তু নিকেল ইমপসিবল। উড়িষ্যায় নিকেল কোথাও নেই।

তাহলে নিকেল এলো কী করে? রতন জানতে চাইল।

খব সোজা। উল্কাপিণ্ড থেকে। উল্কাপিণ্ডে লোহার সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ নিকেল থাকে। দেশি কামার অনেক সময় পাহাড়-জঙ্গলে পড়ে থাকা উল্কাপিণ্ড ভেঙে নিয়ে আসে লোহার প্রয়োজনে। অনেক প্রাচীন জিনিসে নিকেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেই নিকেল এসেছে। উল্কাপিণ্ডের লোহার সঙ্গে।

রতন বলল, তা হতে পারে। কিন্তু উড়িষ্যায় নিকেল যে নেই, তার প্রমাণ কী?

ত্রিপাঠীর মুখে বক্রহাসি ফুটে ওঠে। বলেন–প্রমাণ হচ্ছে, এখনও কেউ তার সন্ধান পায়নি। থাকলে নিশ্চয় পেত। দেখুন, আপনার অনুসন্ধিৎসু মনের প্রশংসা করি। কিন্তু এসব হচ্ছে, অল্প বয়সের রোমান্টিক কল্পনা।

রতন তেতে ওঠে। বলে–আমার ধারণা একেবারে উড়িয়ে দেবার কারণ নেই। আগে তো অনেকে ভাবতেন, উড়িষ্যায় ক্রোম নেই। কিন্তু পরে তো পাওয়া গেছে। তেমনি নিকেলও থাকতে পারে।

ত্রিপাঠীর মুখ লাল হয়ে উঠল। বললেন, বেশ তো, দেখুন না খুঁজে। যদি নিকেল পেয়ে যান তাহলে তো ইউ উইল বি এ হিরো।

তাঁর কণ্ঠের প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ আমাদের কান এড়ালো না।

.

বাড়ি এসে রতন অনেকক্ষণ গুম মেরে বসে রইল।

তারপর হঠাৎ আমাকে বলল, জানিস প্রতাপ ছোটকাকার বন্ধু জিওলজিস্ট মিস্টার পট্টনায়ক একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন–উড়িষ্যার এই অঞ্চলে, এই পাহাড় বনরাজ্যে কত প্রাকৃতিক গুপ্তধন, কত খনিজ পদার্থ লুকিয়ে আছে। তাদের সামান্যই আবিষ্কার হয়েছে। আমরা যে কিছু খুঁজে পাব না তা কেউ বলতে পারে?

আমি বললাম, তোর কী মতলব বলতো?

রতন আর ভণিতা করল না।

কেল্লাপাহাড়ে যাব–নিকেল খুঁজতে। বাড়িতে বলব কেল্লা সার্ভে করতে যাচ্ছি, তাহলে কাকা আপত্তি করবে না। নিকেল খুঁজতে যাচ্ছি বললে কাকা আবার ত্রিপাঠীকে ফোন করে বসবে, তখন ও লোকটা বাগড়া দিয়ে সব ভণ্ডুল করে দেবে।

একা যাবি? আমি প্রশ্ন করলাম।

রতন বলল, কেন–তুই তো আর্কিওলজির লোক। তোর পুরনো কেল্লায় কোনো ইন্টারেস্ট নেই বলতে চাস?

একশোবার আছে। আর ডাকু? ডাকু যাবে না?

আলবৎ। ডাকু হবে আমাদের গাইড।

বিকেলে গেলাম ডাকুর ঘরে। গিয়ে দেখি শ্রীমান বন্দুক পরিষ্কার করছে। বলল, ভাবছি শিকারে যাব দু-একদিনের জন্য।

মতন বলল, শিকার-টিকার বাদ দে। তোকে কেল্লাপাহাড়ে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে।

হঠাৎ?

রতন আসল কারণটাই বলে ফেলল। ডাকু বলল, ভালোই হল। আমিও ওদিকটায় যাবার প্ল্যান করছিলাম। যদি কিছু পাওয়া না যায়, একটা অ্যাডভেঞ্চার তো হবে।

রতনের কাকা সহজেই অনুমতি দিলেন। তবে এটাও বললেন যে আমরা যেন খুব বিেশ কিছু আশা না করি। যা শুনেছি, দুর্গটা খুব সাধারণ। আসলে ওটা ছিল এক সামন্ত রাজার জেলখানা। কিছু সৈন্যও থাকত। রাজা যুদ্ধে হেরে গেলে ওটা শত্রুরা ধ্বংস করে দেয়। তবে সুড়ঙ্গ-টুড়ঙ্গ নাকি আছে।

এটাও বলে দিলেন রতনের কাকা যে আমরা যেন তিন চার দিনের বেশি না থাকি, আর সঙ্গে যেন বন্দুক অবশ্যই থাকে।

অবাক করলেন বোসদা।

আড্ডা দিতে এসে শুনলেন আমাদের অভিযানের সংকল্প, আর ধাঁ করে বলে বসলেন, ব্রাদার, আমিও যাব। এই আবদারের পিছনে কারণটাও অবিশ্যি তখনই বলে দিলেন।

বুঝলে কিনা ব্রাদার, ছোটবেলা থেকে আমি অ্যাডভেঞ্চারের ভক্ত। প্রচুর বই পড়েছি অ্যাডভেঞ্চারের। কল্পনা করেছি গভীর জঙ্গলের মধ্যে তাঁবুর পাশে রাতে আগুন জ্বেলে বসে আছি, যেমন থাকত চাঁদের পাহাড়-এর শঙ্কর। কিন্তু লাক খারাপ। কোনো সত্যি অ্যাডভেঞ্চার জোটেনি ভাগ্যে। এবার সুযোগ যখন পেয়েছি ছাড়ছি না কিছুতেই।

বললাম, আপনার কষ্ট হবে।

আরে কষ্ট করতেই তো যাব। কষ্ট পাব, ভয় পাব, তবে তো! বুঝলে ব্রাদার, তোমাদের বউদি বড় খোঁচা দেয় আমায়। বলে, তুমি বেজায় কুনো। বসে বসে কেবল বই পড়ো। জঙ্গলে থেকেছ কখনও এক রাত্তির? এবার তার মুখ বন্ধ করে দেব। আমাদের ইতস্তত করতে দেখে বোসদা বললেন, আমি তোমাদের ভার হব না ব্রাদার। আমি নেব তোমাদের কিচেনের ভার। জানো, অফিসের পিকনিকে সব রান্না এই শর্মা এক হাতে সামলায়।

রতন অগত্যা বলল, ঠিক আছে, চলুন।

বোসদা চলে যেতে রতন বলল, উনি গেলে ভালোই হবে। তবে আমাদের অভিযানের আসল উদ্দেশ্য মানে নিকেলের ব্যাপারটা, ওঁকে জানানো চলবে না। যদি খালি হাতে ফিরি, লোকে ওর কাছেই জানবে আমরা শুধু দুর্গ দেখতে গিয়েছিলাম। তাছাড়া রান্নার হ্যাঁঙ্গামা নেবেন বলছেন। আমরা বেশি সময় পাব খুঁজতে।

রতনের কাকিমা বোসদা যাবেন শুনে খুব খুশি। কাকা নিজেই বোসদার ছুটির ব্যবস্থা করে দিলেন। বোধহয় ভাবলেন, ভালোই একজন গার্জেন রইল সঙ্গে।

যাবার দিন ডাকু বলল, জানিস ওই পাহাড়টার একটু বদনাম আছে শুনলাম।

–মানে ভূত-টুত নাকি? জিজ্ঞেস করি।

–হ্যাঁ ওই আর কি। যুদ্ধ হয়েছে। অনেক লোক মরেছে ওখানে, তাই! স্থানায় সে নাকি কেউ ও পাহাড়ে রাতে থাকে না।

বললাম, এ খবর বোসদাকে দিসনি। শেষে ভয় পাবেন অনর্থক।

.

আবার সেই কেওক্ষর-জাজপুর রোড। ভোরের আলো সবে ফুটছে। মোটর চলেছে। হু-হুঁ করে। বোসদা সমানে কথা বলছেন–বাঃ, কী দৃশ্য দু-পাশের! আচ্ছা ডাকু, পাহাড় কত উঁচু হবে? পাহাড়ে খুব জঙ্গল নাকি?...

আনন্দপুরে এক চায়ের দোকানে থামলাম আমরা। চা খাচ্ছি, এমন সময় আর একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল কাছে। আরোহী একা চালক, মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। লম্বা, ফরসা, রোদে পোড়া চেহারা। পরনে কালো ফুলপ্যান্ট ও হলুদ বুশ সার্ট। হাতে জ্বলন্ত চুরুট। আগন্তুক কৌতূহলভরে আমাদের লক্ষ করে গাড়ির মাথায় বাঁধা মোটঘাট দেখে ইংরেজিতে করলেন, শিকারে চলেছেন বুঝি?

রতন বলল, শিকার না। যাচ্ছি একটা পুরনো কেল্লা সার্ভে করতে।

পুরনো কেল্লা? কোথায়?

একটা পাহাড়ের ওপরে। এখানে পাহাড়টাকে বলে কেল্লাপাহাড়।

বুঝেছি। ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে বলেন, তা আপনারা কি আর্কিওলজিকাল ডিপার্টমেন্টের লোক?

রতন উত্তর দিল।–না। আমাদের মধ্যে এই প্রতাপ অবশ্য আর্কিওলজিস্ট। বাকি আমরা যাচ্ছি শখ করে। একটা আউটিং বলতে পারেন। আপনি?

ও হো, দেখুন দিকি নিজের পরিচয় দিতে ভুলে গেছি। আর প্রশ্ন করে চলেছি। মাপ করবেন, বন-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বুনো হয়ে গেছি! আমার নাম চন্দ্রজিৎ সিং। উড়িষ্যায় ব্যবসা করি। কেল্লাপাহাড় আমি চিনি। ওই দিক থেকেই আসছি। ও জায়গায় যাওয়া কিন্তু এখন সে নয়।

কেন? প্রশ্নটা একই সঙ্গে আমাদের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

কারণ একটা হাতি। হাতিটার মেজাজ বিগড়েছে। আর কেল্লাপাহাড়ের কাছেই ঘোরাফেরা করছে। জানেন তো, নিঃসঙ্গ খ্যাপা হাতি কী ভয়ংকর জীব। কেল্লাপাহাড়ের কাছে এক পাহাড়ে আমি কাঠ কাটার ইজারা নিয়েছি। সেই কাজে যাচ্ছিলাম। কিন্তু যেতে পারিনি। ফিরে এলাম।

আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি। দলে শিকারী বলতে তো একমাত্র ডাকু। সে দেখি ভুরু কুঁচকে চুপ করে আছে। এমন সময় রতন বলে উঠল, বেরিয়েছি যখন, যাই। তেমন বিপদ বুঝলে ফিরে আসব। কি রে ডাকু?

ডাকু মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল–হুঁ।

আচ্ছা। গুডলাক্। চন্দ্রজিৎ সিং আমাদের হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে লম্বা পা ফেলে একটা দোকানের দিকে চলে গেলেন।

আমি বললাম, রতন, তোর কথা ভদ্রলোকের পছন্দ হয়নি। হয়তো ভাবলেন–ছেলেগুলো অতিরিক্ত ঠ্যাটা।

রতন বলল, ভাবুক গে।

আমরা আবার রওনা দিলাম। হাতির কথায় মনে একটু ভাবনা ঢুকিয়ে দিল যাহোক।

জগন্নাথপুরের কাছে গিয়ে গাড়ি জাজপুর রোড ছেড়ে ডান দিকে এক পাহাড়ি রাস্তা ধরল। প্রায় শুকনো নালার পাশে পাশে পাথুরে রাস্তা। এ জায়গা টোমকা এবং মহাগিরি পর্বতমালার মধ্যবর্তী অংশে। ডানদিকে দূরে দেখা যাচ্ছে ঢেউয়ের মতো পর্বতপুঞ্জ। নীলাভ অস্পষ্ট। বাঁ-দিকে কাছেই অল্প উঁচু এক পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে উদ্ভিদের ঘন সবুজ প্রলেপ।

ডাকু বলল, ওই বোধহয় কেল্লাপাহাড়।

প্রায় মাইল চার যাবার পর একটি গ্রাম পেলাম। ছোট্ট আদিবাসী গ্রাম। গ্রামের নাম পলাশবুনি। গ্রামে খোঁজ করে জানলাম–হ্যাঁ এই বাঁ-পাশের পাহাড়ই হচ্ছে কেল্লাপাহাড়। তবে পাহাড় অবধি গাড়ি যাবে না। মাইল খানেক হাঁটতে হবে পাহাড়ে পৌঁছতে। অতএব গাড়ি ছেড়ে দিয়ে মোটঘাট কাঁধে তুলে আমরা পায়ে হেঁটে রওনা দিলাম কেল্লাপাহাড় লক্ষ্য করে।

.

০৪.

ক্রমে চড়াইয়ে উঠি। পাহাড়ের পাদদেশে ঘন বাঁশ বন আর বাবলা গাছ। বড় বড় পাথরের খণ্ড ছড়িয়ে পড়ে আছে। কয়েকটা তেঁতুল আর বুনো আমগাছ দেখলাম।

কিছুদূর এগিয়ে যেতেই একটা সিঁড়ি পড়ল। যেটা পাহাড়ের পায়ের কাছ থেকে শুরু হয়ে, পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠে গেছে। ডাকু বলল এটাই নাকি কেল্লার সিঁড়ি। আমরা উঠতে শুরু করলাম সিঁড়ি দিয়ে।

আমাদের ঘিরে ঘনবদ্ধ জঙ্গল। মোটা মোটা লতা দুলছে বিশাল বনস্পতিকে আকড়ে ধরে। শাল, কেন্দু, মহুয়া, নিম, জাম, আরও কত কী গাছ। পাতা ও শাখার আবরণে যেন চন্দ্রাতপ সৃষ্টি হয়েছে মাথার ওপরে।

যেতে যেতে চোখে পড়ল ময়ুর, বনমোরগ, আরও রকমারি পাখি। নানা অজানা গন্ধ পাই তরুলতার। এক জায়গায় কয়েকটা শিমুলগাছ দেখলাম। উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ফুলের সমারোহে গাছ যেন অগ্নিশিখা। প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর সামনে দেখলাম প্রাচীর। অর্থাৎ কেল্লায় পৌঁছেছি।

অন্তত দশ ফুট উঁচু পাথরের চওড়া প্রাচীর পাহাড়ের অনেকখানি জায়গা ঘিরে রয়েছে। সিঁড়ি শেষ হল প্রাচীরের গায়ে, এক ভাঙা তোরণের সামনে। সামনেই দেখলাম কেল্লা।

ভিতরের জমি মোটামুটি সমতল। প্রাচীরঘেরা অংশ প্রায় দুশো ফুট চওড়া। লম্বা কতটা বোঝা যাচ্ছিল না। প্রাচীর অদৃশ্য হয়েছে গাছপালার ভিতরে। আমাদের মুখোমুখি পাঁচিল-ঘেরা একটি একতলা বাড়ি। ঝোঁপ ও আগাছা পাথরের ঘরগুলিকে গ্রাস করেছে। ভিতরে ঢোকে না বোধহয় কেউ। কেল্লার উঠোন পাথরে বাঁধানো। কোথাও পাথর সরে। মাটি বেরিয়ে পড়েছে, সেখানে জন্মেছে উদ্ভিদ। তবে কেল্লার ভিতরের অংশে বড় গাছ বেশি নেই।

সামনের পাঁচিল-ঘেরা বাড়িটা দেখে মনে হল এটা ছিল বন্দিশালা। উঁকি মেরে দেখলাম– ভিতরে ছোট ছোট অনেক ঘর। জানলা নেই। শুধু ঘুলঘুলি। কপাটহীন ফটক ও দরজাগুলি হাঁ করে আছে। একটা অশ্বত্থগাছ লম্বা শিকড় ও ডালপালা বিস্তার করে বাডিটার। ঘাড়ে চেপে বসেছে।

ভিতরে বুনোজন্তু বা সাপ থাকতে পারে, তাই ঢুকলাম না ঘরের মধ্যে।

দক্ষিণদিকে একটু ঢালু। প্রায় একশো গজ লম্বা প্রাচীরের সীমানা ক্রমে বেঁকে গেছে। এই অংশেও একটা বাড়ি। লম্বা লম্বা পাঁচটি ঘর। সঙ্গে কয়েকটি ছোট ঘরও রয়েছে। এটা বোধহয় সৈন্যাবাস ছিল। দুর্গের কোথাও কোনো কারুকার্য নেই। চৌকো চৌকো প্রসব তৈরি।

কাছেই এক ঝরনা। এক কুণ্ড থেকে স্বচ্ছ ক্ষীণ জলধারা উপচে পড়ে বয়ে চলে অগভীর পাথুরে খাতের মধ্য দিয়ে। তারপর পশ্চিম প্রাচীরের গায়ে এক ফুটোর ভিতর দিয়ে গিয়ে কেল্লার বাইরে পাহাড়ের ঢালে নেমেছে। ঝরনার কাছে এক মস্ত শালগাছ। সেখানেই তাঁবু ফেলা স্থির হল।

বোসদা তখুনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তাঁবু টাঙাতে। আমরাও হাত লাগালাম। ঝোঁপ কাটা, খুঁটি পোতা, তাঁবু খাটানো, জিনিস গোছ-গাছ করা ইত্যাদি করতে ঘণ্টা দুই সময় লাগল। এরপর ঝরনার জলে চান করলাম সবাই। চমৎকার ঠাণ্ডা জলে সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেল যেন। দুপুরের খাওয়া সঙ্গেই এনেছিলাম, পাঁউরুটি ও মাংস। তাঁবুর সামনে সতরঞ্চি পেতে সবাই খাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ দেখি বোসদা বিস্ফারিত চোখে ওপর দিকে চেয়ে আছেন।

পরমুহূর্তেই শুকনো কাঁপা কাঁপা গলায় কথা এল, ব্রাদার, এ তো ডেঞ্জারেস জায়গা। এখানে তাঁবু ফেলা কি ঠিক হল?

আমরাও সকলে বোসদার দৃষ্টি অনুসরণ করে ওপর দিকে চাইতে, ব্যাপারটা বুঝলাম। শালগাছের গায়ে এক বিরাট মৌমাছির চাক।

ডাকু অভয় দিল–বিরক্ত না করলে কিছু বলবে না ওরা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তবে উনুনটা দূরে করুন।

ভরসা পেয়ে খাওয়া সেরে বোসদা কাঠ-কুটো সংগ্রহ করতে লেগে গেলেন। রাতের রান্নার জন্য উনুন জ্বালাতে হবে।

ডাকু বলল, আমি বেরোচ্ছি। দেখি যদি ছোটখাটো শিকার পাই খাবার মতো।

রতন বলল, মনে আছে তো ক্রোম-পাথর চিনিয়ে দিয়েছি। ওই রকম পাথর কোথাও দেখলেই স্যাম্পল নিয়ে আসবি। নিকেল মেশানো পাথর তো বাইরে থেকে চেনা যায় না। অ্যানালিসিস্ করে তবে জানা যায়, নিকেল আছে। কিন্তু আমার ধারণা ক্রোম পেলেই তার কাছে নিকেল থাকবে, মানে ক্রোম যদি পাই, তার ধারে-কাছের পাথর নিয়ে পরীক্ষা করলে হয়তো নিকেলের সন্ধান পাব। তাই ক্রোমের ওপর লক্ষ রাখব সবাই। তাছাড়াও যদি দেখি কোথাও পাথর খোঁড়াখুঁড়ির চিহ্ন, সেখান থেকে স্যাম্পল নিয়ে যাব।

ডাকু বন্দুক ঘাড়ে চলে গেল।

বোসদা বললেন, আমি ভাই আজ টায়ার্ড। কাল বেরোব। রান্নাটা করে ফেলব। তোমরা দজনে ঘুরে এসো। তবে তাড়াতাড়ি ফিরো কিন্তু সন্ধ্যার আগেই। তিনি সতরঞ্চি বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন।

আমি রতনকে বললাম, পনেরো মিনিট অপেক্ষা কর। কেল্লাটা একটু ঘুরে দেখে নিই। হাজার হোক, সার্ভে করব বলে এসেছি যখন। তারপর তোর সঙ্গে যাব ক্রোমের খোঁজে।

অল্প সময়ে যতটুকু পারি দেখলাম কেল্লা। কেল্লার দুটি অংশ। দুর্গ প্রাচীরের পিছনে পাহাড়ের ঢাল খাড়াই নেমেছে অন্তত কুড়ি হাত। কোথাও স্বাভাবিক পাহাড়ের ঢাল। কোথাও বা পাথর কেটে ঢাল বানানো হয়েছে, কেউ যাতে সহজে উঠে আসতে না পারে। পব-পশ্চিমে দুটি সিঁড়ি নেমে গেছে কেল্লা থেকে। সিঁড়ির মুখে ভাঙা তোরণ। সাত্য এ দর্গের কোনো বিশেষত্ব নেই। নেহাত সাধারণ। শত্রুর আক্রমণ ঠেকাবার পক্ষেও মোটেই সুরক্ষিত নয়। ঝোঁপ-ঝাড় ভেদ করে দুর্গের ঘরগুলির ভিতরে ঢোকার আর উৎসাহ হল না।

পশ্চিম দিকে সিঁড়ি বেয়ে আমি ও রতন সোজা পাহাড়ের তলায় নেমে এলাম পাহাড়ের গা ঘেঁষে একটা নদী গেছে। মরা নদী। জল প্রায় নেই এখন।

রতন বলল, অনেক সময় বর্ষার জলে ধুয়ে পাহাড়ের ওপর থেকে নানারকম পাথর এসে পড়ে নদীতে। নদী-খাতে লক্ষ রাখ। ক্রোম-পাথর দেখতে পেলে কোনখান থেকে নেমেছে পাথরটা, আন্দাজ করে খুঁজব।

স্রোত ধরে ধরে চললাম, সন্দেহ মতো কয়েকটা পাথর তুলে দেখালাম রতনকে। নাঃ, ক্রোম নয়। কতকগুলো হরিণ দেখলাম–ঘাস খাচ্ছে। খয়েরি গায়ে সাদা গোল গোল

ছোপ। আমাদের দিকে উৎকর্ণভাবে তাকাল একটুক্ষণ। তারপরই ঠ্যাং তুলে লাফাতে লাফাতে দে দৌড়।

ঘণ্টাখানেক পর আমরা পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্তে উপস্থিত হলাম।

দক্ষিণদিকে পাহাড় ক্রমশ সরু হয়ে অন্য একটা পাহাড়ের গায়ে গিয়ে শেষ হয়েছে। দুই পাহাড়ের মাঝখানে খাদ। এখন খাদে ঢোকা উচিত হবে না মনে করে একটা পায়ে চলা পথ ধরে পাহাড়ে চড়তে লাগলাম। মতলব পাহাড়ের ওপর থেকে খাদের ভিতরে দেখব একবার। কয়েক পা যেতেই হঠাৎ রতনের ভয়ার্ত চাপা। স্বরে আমাকে থামতে হল।

প্রতাপ দাঁড়া। নড়িস নি একদম।

তখন কয়েক মুহূর্তের জন্য আমি পাশের দিকে গাছের ওপরে একটা পাখিকে লক্ষ করছিলাম, দাঁড়িয়ে পড়ে সামনে চাইতেই দেখি সাক্ষাৎ যম।

মাটি থেকে প্রায় চারফুট খাড়া হয়ে ফণা ধরে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এক বিশাল সাপ। মাত্র পাঁচ ছয় হাত দূরে। অল্প অল্প দুলছে। তীব্র ক্রূর দৃষ্টি তার।

আমার সঙ্গে বন্দুক আছে, কিন্তু সেটা কাঁধে ঝুলছে। সেটা কাধ থেকে নামিয়ে গুলি করবার সময় নেই। আমি পাথরের মতো স্থির। জানি বিন্দুমাত্র নড়াচড়া করলে আক্রমণ

করবে সাপ। সম্মোহিতের মতো চেয়ে থাকি ওর চোখে চোখে। শরীর কেমন অবশ হয়ে আসে। হঠাৎ–গুড়ুম! এবং সেই মুহূর্তে ম্যাজিকের মতো সাপ অদৃশ্য।

পিছনে তাকিয়ে দেখলাম কিছু দূরে উঁচু পাথরের ওপর ডাকু দাঁড়িয়ে। তার বন্দুকের নল দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। সাপটাকে পাওয়া গেল কাছেই। ছিন্নভিন্ন ফণা, অবশ্যই মৃত। তবে তখনও দেহটা পাকসাট খাচ্ছে।

ডাকু রেগে বলল, শুধু হাঁ করে প্রকৃতির সৌন্দর্য গিললেই হয় না। জঙ্গলের বিপদের কথাও খেয়াল রাখতে হয়।

সাপটা অন্তত আট ফুট লম্বা। সাদার ওপর সারা গায়ে কালো কালো ডোরা কাটা।

–কী সাপ? জিজ্ঞেস করলাম।

ডাকু বলল, শঙ্খচূড়। কিং কোবরা। সাপের রাজা। সাংঘাতিক বিষাক্ত।

আমরা সাপটার দেহ কাঠ-পাতা জ্বেলে পুড়িয়ে দিলাম।

বেলা আর বেশি নেই। রোদ পড়ে আসছে। খাদে ঢুকতে আর ভরসা হল না। সবাই ফিরে চললাম তাঁবুতে। একটু পরেই পেলাম সেই পরিচিত সিঁড়ি।

কেল্লার প্রাচীরের কাছে হাজির হয়েছি, ভাঙা তোরণ দিয়ে ঢুকব, এমন সময় কেমন একটা আওয়াজ এল কানে। বোঁ বোঁ বোঁ–কোনো এরোপ্লেন নাকি? তাকালাম। কই, না তো!

ডাকু পা টিপে টিপে উঠে প্রাচীরের পাশ থেকে একবার উঁকি মেরেই চট করে সরে এল। তারপর চাপা গলায় বলল, মৌমাছি! চারধারে উড়ছে। তাঁবুর ওপরেও। অন্ধকার হয়ে গেছে জায়গাটা।

সর্বনাশ! বোসদা যে রয়েছেন ওইখানেই!

বেশ কিছুক্ষণ পরে বোঁ বোঁ আওয়াজ কমল। ডাকু আবার উঁকি দিয়ে এসে বলল, চল এখন। ওগুলো চাকে বসেছে আবার। তাছাড়া সন্ধে হয়ে গেছে। আর উড়বে না।

সাবধানে তাঁবুর কাছে গেলাম। দুটো তাঁবু খাটানো হয়েছে। একটায় থাকবে রতন ও ডাক, অন্যটায় আমি আর বোসদা। বাইরে রান্নার জিনিসপত্র ছড়িয়ে আছে। এক হাঁড়ি ঢাকা দেওয়া খিচুড়ি। উনুনের আগুন নিবুনিবু। কিন্তু বোসদা কই?

আরো এগিয়ে আমাদের তাঁবুর ভিতর উঁকি দিতেই দেখি বোসদা আপাদমস্তক কম্বল মুড়ে শুয়ে রয়েছেন।

আমাদের গলা শুনে তিনি ফ্যাকাসে মুখ করে বেরিয়ে এলেন। উঃ ব্রাদার, কী ডেঞ্জারেস কাণ্ড! খুব বেঁচে গেছি প্রাণে। তাঁবুতে ঢুকে পেট্রোম্যাক্সে তেল ভরছি, হঠাৎ বাইরে কেমন অদ্ভুত শব্দ পেলাম। মুখ বের করে দেখে তো আমার আক্কেল গুড়ুম। বাপরে! বোসদার কাঁপুনি তখনও থামেনি। বললেন, এখান থেকে সরে পড়ো ব্রাদার, প্লিজ! ওপাশে বরং তাঁবু খাটাব কালকে।

–ঠিক আছে, তাই হবে। আমরা বোসদাকে আশ্বস্ত করি।

ডাকু ইতিমধ্যে মৌচাকের নিচে গিয়ে দেখছিল। বলল, কেউ ঢিল মেরেছে বা খোঁচা দিয়েছে চাকে। অনেকখানি দেখছি ভেঙে ঝুলে পড়েছে। কিংবা শুকনো ডাল ছিটকেও লাগতে পারে। কিন্তু না, তেমন কোনো ডাল তো পড়ে নেই তলায়। কিন্তু কে ভাঙল চাক? কেন?

আমি বললাম, হয়তো কেউ আমাদের তাড়াতে চায় এখান থেকে। তাই বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে।

ডাকু বলল, হুঁ, তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু কেন?

রতন দৃঢ়স্বরে বলল, ডাকু জেনে রাখ, এ কীর্তি যারই হোক, তাড়াতে চাইলেই অত সহজে আমরা পালাচ্ছি না।

ডাকু বলল, রাইট।

ঝপ করে অন্ধকার নামল। পেট্রোম্যাক্সের উজ্জ্বল আলোর গণ্ডির ওপারে গাছপালা, কেল্লা বাড়ি সব কেমন ভুতুড়ে ঠেকে। চারপাশে চাপ চাপ অন্ধকার। যেন হাত দিয়ে ছোঁয়া। যায়। রাতে অরণ্যময় পর্বত মুখর হয়ে ওঠে। কত রকম আওয়াজ শুনি।

বোদা চোখ বড় বড় করে বললেন, টেরিফি। উঃ-একে বলে রিয়েল জঙ্গলে। ক্যাম্প-লাইফ! নিজেকে কার মতো লাগছে জানো ব্রাদার–লিভিংস্টোন।

পরিশ্রান্ত সবাই। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলাম। খিচুড়ি, আলুর দম ও আচার। বোসদার রান্নার হাত সত্যি খাসা। সবাই চেয়ে চেয়ে খেলাম। খাওয়ার পরই শোয়া। ক্যাম্পখাটে শুতে না শুতেই ঘুমের রাজ্যে ঢলে পড়ি।

ব্রাদার! ও প্রতাপ! বোসদার গলা!

কী ব্যাপার। উঠে বসলাম।

বোসদা বললেন, শোনো কীসের আওয়াজ। ওই দিক থেকে আসছে।

বোসদার মুখ ফ্যাকাসে। তিনি কেল্লা-বাড়ির দিকে দেখান।

সত্যি-বিচিত্র একটা শব্দ হচ্ছে থেকে থেকে। যেন কান্নার আওয়াজ। আর্তনাদ। খুব ক্ষীণ।

এ কীসের শব্দ?

তাঁবুর বাইরে উঁকি দিলাম। তাঁবুর সামনে কাঠ জ্বেলে রাখা হয়েছে যাতে বুনোজন্তু না আসে কাছে। সেই আগুনের স্বল্প আভার পিছনে গাঢ় আঁধার।

একটু গা শিরশির করছিল। মনে পড়ল এ পাহাড় ভালো নয়। রাতে কেউ থাকে না এখানে। বহু বন্দী যন্ত্রণাকাতর মৃত্যুবরণ করেছে কারাগারে। একি কোনো জীবন্ত প্রাণীর আর্তনাদ? না কোনো অতৃপ্ত আত্মার ক্রন্দনধ্বনি?

মনের ভয় মুখে প্রকাশ করলাম না। বললাম, ও কিছু না। বোধহয় কোনো পাখির বাচ্চা কাঁদছে। কাল জিজ্ঞেস করব ডাকুকে। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়ুন।

একটু পরেই বোসদার নাসিকা গর্জন শুনতে পেলাম। আমার কিন্তু অনেকক্ষণ ঘুম এল চোখে।

.

০৫.

পরদিন সকালে উঠে আমি আর রতন ঠিক করলাম যে আজ আমরা ক্রোম-পাথরের সন্ধানে কেল্লাপাহাড়ের পুবদিকে ঘুরে দক্ষিণে গিয়ে খাদের ওদিকটা দেখব। ডাকুর পাথরে ইনটারেস্ট নেই। সে বলল একাই বেরোবে।

বোসদা বললেন, একটা বন্দুক আমার জন্যে রেখে যেও ব্রাদার। আমিও যদি পারি অন্তত কেল্লাটা একবার ঘুরে দেখে নেব।

সবে কফি বিস্কুট সহযোগে প্রাতরাশ শেষ করেছি এমন সময় সিঁড়ির মুখে এক মূর্তির আবির্ভাব ঘটল। শ্যাম চিক্কণ দশাসই চেহারা, পরনে খাকি হাফপ্যান্ট ও শার্ট। কোমরে বেল্ট, মাথায় টুপি। নিঃসন্দেহে পুলিশ অফিসার।

পিছনে আরও দুটি লোককে আবার দেখা গেল–তারা বোধহয় কনস্টেবল।

অফিসারটি সোজা আমাদের দিকে এগিয়ে এসে হেঁড়ে গলায় বললেন, আমি রামচন্দ্রপুর থানার ওসি শ্রীবলরাম দাস। মিস্টার দত্ত আপনাদের খোঁজ করতে বললেন।

কী ব্যাপার? রতন প্রশ্ন করল।

বলরাম দাস পকেট থেকে ডিবা বের করে খুলে দুটি পান নিয়ে মুখে পুরে একগাল হেসে বললেন, দেখে মনে হচ্ছে আপনারা দিব্যি আছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনাদের আর এখানে থাকা হবে না।

থাকা হবে না? রতন অবিশ্বাসের সুরে প্রশ্ন করল।

আজ্ঞে না। আপনাদের গাড়ি আসবে পলাশবুনি গ্রামে দুপুর দুটো নাগাদ। আপনারা দয়া করে সেই গাড়িতে ফিরে যাবেন। মিস্টার দত্তর হুকুম।

কিন্তু কেন? আমি আর রতন প্রায় একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম।

জায়গাটা মোটেই নিরাপদ নয়। বলরামবাবু পান চিবোতে চিবোতে বললেন।

আপনি কি পাগলা হাতির কথা বলছেন?

প্রশ্নটা এল ডাকুর কাছ থেকে। হাতির কথাটা আমারও কাল থেকেই অনেকবার মনে হয়েছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেটার কোন লক্ষণ দেখিনি বলে ও নিয়ে আর ভাবছিলাম না।

বলরামবাবু প্রশ্নটা শুনে ভুরু কুঁচকে বললেন, পাগলা হাতি? কই না তো। পাগলা হাতির কথা কে বলল আপনাদের?

চন্দ্রজিৎ সিং-এর নাম শুনে ভদ্রলোক একটা অত্যন্ত অবজ্ঞাসূচক ভাব করে বললেন, ও লোকটাকে মোটেই পাত্তা দেবেন না। খুব সন্দেহজনক চরিত্র। অঢেল পয়সা; কিন্তু কীভাবে করেছে তার কোনো হদিস পাওয়া যায় না।...না, পাগলা হাতি নয়। আমি মানুষের কথা বলছি। আপনারা তো বংশীর মৃতদেহ আবিষ্কার করেছিলেন? সেটা খুব সম্ভব অ্যাকসিডেন্ট নয়, খুন। আর বংশী খুন হয়েছে তার নিজেরই ছেলে পঞ্চার হাতে।

নিজের ছেলের হাতে বংশীর মৃত্যু হয়েছিল? কী ভয়ংকর ব্যাপার!

বললামবাবু বলে চললেন, দেব-বাড়ির বিগ্রহ চুরির কথা নিশ্চয় শুনেছেন। যারা চুরি করেছিল সেই গ্যাঙের দুজন ধরা পড়েছে। তারা বলেছে যে তাদের লিডার পঞ্চা বিগ্রহ নিয়ে নাকি এই দিকেই পালিয়ে এসেছে। বংশী যেদিন মারা যায় সেই দিনই সকালে পলাশবুনির একজন তোক ওই পাহাড়ে পঞ্চাকে দেখেছিল বংশীর সঙ্গে উত্তেজিতভাবে কথা বলতে। বংশী কী জানি বোঝাবার চেষ্টা করছিল, আর পঞ্চা ক্রমেই খেপে উঠছিল।

যে লোকটি ঘটনাটা দেখেছিল সে জানত পঞ্চা অতি বেপরোয়া গুণ্ডা। তাই সে বেশিক্ষণ সেখানে থাকেনি। আমার ধারণা বংশী পঞ্চাকে বিগ্রহ ফিরিয়ে দিতে বলছিল এবং পঞ্চা তাতে রাজি হচ্ছিল না। সেই থেকেই কথা কাটাকাটি এবং তারই ফলে সম্ভবত ছেলের হাতে বংশীর মৃত্যু। পঞ্চা বোধহয় তাকে উঁচু থেকে ফেলে দিয়ে মেরেছে। ওই পাহাড়ের এক গুহায় পঞ্চার গ্যাঙের একটা আস্তানা আবিষ্কার হয়েছে। বংশী নিশ্চয়ই আন্দাজ করেছিল পঞ্চা ডাকাতি করে এসে ওখানে লুকিয়েছে। তাই দেখা করতে গিয়েছিল। যাই হোক, পঞ্চা এখন এ তল্লাটেই কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে আছে। আমরা তার অনুসন্ধান চালাচ্ছি, কিন্তু আপনারা দয়া করে আর এখানে থাকবেন না।

কেন? ডাকু প্রশ্ন করল।

কারণ যদি পঞ্চা ভাবে আপনারা তার পিছু নিয়েছেন তাহলে বিপদে পড়বেন।

রতন গোমড়া মুখে বলল, পঞ্চার খবর কাকাকে কে দিল? আপনি বুঝি?

বলরাম দাস হেসে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। কাল কেওঞ্ঝরগড়ে মিস্টার দত্তর সঙ্গে দেখা হল। উনি বললেন, আপনারা কেল্লাপাহাড়ে গিয়েছেন। তখন বললাম পঞ্চার কথা।

দারোগা তো চলে গেলেন কনস্টেবল সমেত, কিন্তু আমাদের সকলেরই উৎসাহে বেশ খানিকটা ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়ে গেলেন। রতন হতাশার সুরে বলল, আমাদের ভাগ্যটাই

খারাপ। ব্যাটা পঞ্চার জন্যে আমাদের অভিযানটা ভণ্ডুল হয়ে গেল। যাক, হাতে আর মাত্র ঘন্টা চারেক সময় আছে। এর মধ্যে যতটা পারি ঘুরে দেখে নিই।

আমি আর রতন আগে বেরিয়ে পড়লাম। দুজনেরই মনটা খারাপ হয়েছিল, কারণ আমার পক্ষে কেল্লাপাহাড়ের বিশেষত্বের অভাব বেশ হতাশজনক। আর রতনও মাত্র মাস ঘণ্টার মধ্যে খনিজ সম্পদ আবিষ্কারের আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছে। এক ডাকু যদি এর মধ্যে কোনো শিকার জোটাতে পারে তবে তার দিক থেকে হয়তো অভিযানটি একেবারে মাঠে মারা যাবে না।

পুবদিকের সিঁড়ি দিয়ে নেমে জানোয়ার চলার পথ ধরে খানিক এগিয়ে যেতে বনরাজ্যের শোভা দেখতে দেখতে মন কিছুটা ভালো হয়ে গেল। এদিকের জঙ্গল পশ্চিম দিকের চেয়ে বেশি ঘন। কিন্তু আধ ঘণ্টা চলার পরও একপাল বাঁদর ছাড়া আর কোনো জানোয়ার চোখে পড়ল না। পাখি আর পোকামাকড় ছাড়া আর কেউই দর্শন দেবে না এমন একটা ধারণা যখন মনে দানা বেঁধে এসেছে, এমন সময় আমাদের সামনে কিছুদূরে হলদে রঙের কী একটা জিনিসকে নড়তে দেখে দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়লাম।

কোনাকুনিভাবে বাঁ-দিক থেকে ডান দিকে এগিয়ে চলেছে জিনিসটা। আমরা দুজনে নিঃশব্দে এগিয়ে গেলাম তার দিকে। একটা লাল গাছের গুঁড়ি ছাড়িয়ে কয়েক পা এগোতেই হাত পঞ্চাশ দূরে প্রাণীটিকে দেখতে পেলাম। ও হরি, জানোয়ার নয় মানুষ।

শুধু তাই নয়, এ মানুষ আমাদের চেনা। ইনি মিস্টার চন্দ্রজিৎ সিং। এই হলদে রঙের শার্টপরা অবস্থাতেই আমরা কাল এঁকে দেখেছিলাম।

ওকে ফলো করব।–ফিসফিস করে বলল রতন, দেখি লোকটা কোথায় যায়।

শুকনো পাতা বাঁচিয়ে পা ফেলে আমরা দুজনে মিস্টার সিং-এর পিছনে ধাওয়া করলাম।

সামনের গাছপালার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে ওদিকের পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছি। আরো কিছুদুর গেলেই কালকের সেই খাদের কাছে পৌঁছে যাব। একবার মনে হল মিস্টার সিং থামলেন। পিছন পিরে দেখলেন কি? ঠিক বোঝা গেল না।

একটা লাল ফুলে ভরা প্রকাণ্ড শিমুল গাছ পেরোতেই আমাদের থেমে যেতে হল।

চন্দ্রজিৎ সিং উধাও।

হয় মোড় নিয়েছে, না হয় ঢালে নেমেছে, নয় গর্তে পড়েছে। মোটকথা তাকে আর দেখা দেখা যাচ্ছে না। সিং যে মতলবেই এসে থাকুন, তার পিছনে আর সময় দেওয়া যায় না ভেবে আমরা দুজনে আবার এগোতে লাগলাম।

ঢালে মিনিট খানেক নামার পর হঠাৎ একটা ঘরঘর শব্দ পেয়ে ঘরে উপরে চাইতেই এক মুহূর্তের জন্য আমার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেল। কেল্লাপাহাড়ের গা বেয়ে একটা প্রকাণ্ড পাথর গড়াতে গড়াতে আমাদের দিকে ধাওয়া করে আসছে। রতন আমার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে আমাকে সরিয়ে দিতেই পাথরখানা আমাদের প্রায় গা ঘেঁষে নিচের দিকে নেমে চলে গেল। পরমুহূর্তে ধড়াম করে আছড়ে পড়ল তলায়। বন্ধ করা নিশ্বাসটা ছেড়ে রতনের দিকে ফিরে বললাম, ব্যাপার কী বলতো? এটা কি প্রকৃতির কীর্তি না মানষের?

একটা কান ফাটানো বন্দুকের গর্জনে রতনের উত্তর চাপা পড়ে গেল। পর পর এতগুলো অস্বাভাবিক ঘটনায় দুজনেই বেশ ঘাবড়ে গেলাম। কোত্থেকে এল এ বন্দুকের শব্দ? ডাকু কোনো জানোয়ারকে ধরাশায়ী করল নাকি? রতন হঠাৎ আমার আস্তিনটা খামচে ধরে বলল, ওই দেখ।

দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখি পাহাড়ের গা দিয়ে উধ্বশ্বাসে নেমে আমাদের উলটো দিকে ছুটে চলেছেন স্বয়ং চন্দ্রজিৎ সিং।

দেখতে দেখতে লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল! আশ্চর্য, ওঁর মুখে এমন আতঙ্কের ভাব দেখলাম কেন! বন্দুকই বা ছুড়ল কে?

এই যে ব্রাদার।

বোসদার গলা। তিনিও পাহাড়ের গা দিয়ে নেমে আসছেন, এবং দ্রুত নামার চেষ্টায় মাঝে মাঝে পা হড়কে রীতিমতো বেসামাল হয়ে পড়ছেন। মাথার ওপরে তোলা তার ডান হাতে বন্দুক আঁকড়ে ধরা রয়েছে।

কী ব্যাপার বোসদা? আমি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

বোসদা আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, ব্রাদার টাইগার! জলজ্যান্ত টাইগার! গাছের ফাঁক দিয়ে দেখলাম তার হলদে রঙ রোদে ঝলমল করছে। ইস্–একটুর জন্যে মিস্ হয়ে গেল।

সব্বনাশ। রতন বলল।–আপনি যে মানুষ খুনের দায়ে পড়তেন। ওটা বাঘ নয়, মিস্টার চন্দ্রজিৎ সিং।

অ্যাঁ। বোসদার চোখ কপালে। বলো কী। ভাগ্যিস নার্ভাস হয়ে গিছলুম, তাই গুলিটা ওপর দিয়ে চলে গেল।

দিন,–ওটা আমাকে দিন।

রতন বোসদার হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে নিল। তারপর তার নিজের লাঠিটা বোসদাকে দিয়ে বলল, সাপ মারতে–লাঠিই যথেষ্ট।

এবার আমরা তিনজনে এগোতে শুরু করলাম।

মিনিট পাঁচেক যেতেই আমরা খাদের ধারে পৌঁছে গেলাম।

ওরা কারা হে রতন? পঞ্চার গ্যাঙের লোক নয়তো?

বোসদা সামনের দিকে চেয়ে প্রশ্নটা করলেন। খাদের ওপারে দক্ষিণের পাহাড়ের গায়ে খানিকটা সমতল জায়গা, তার মধ্যে ছোট বড় পাথর সাজানো রয়েছে। তারই মধ্যে দুটো। বড় পাথরের মাঝখানে ফাঁকে দুটো লোক দাঁড়িয়ে আমাদের লক্ষ করছে।

কে, ওরা!

রতন বন্দুকটা বাগিয়ে ধরল। আমরা তিনজনে ওদিকে চললাম।

আদিবাসী বলে মনে হচ্ছে। রতন চাপা গলায় বলল। সেটা আমারও মনে হয়েছিল, কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে তাদের কৌতূহল কী কারণে তা বুঝতে পারছিলাম না।

ভারি থ্রীলড লাগছে ব্রাদার। বোসদা ফিসফিসিয়ে তার চাপা উত্তেজনা প্রকাশ করলেন, একেবারে পুরোপুরি জাঙ্গল অ্যাডভেঞ্চার।

আরো খানিক এগোতেই লোক দুটো পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। কী ব্যাপার। সবাই কি এভাবে দুরে থেকে দেখা দিয়ে চলে যাবে? নাকি যেখানে রহস্য নেই সেখানেও রহস্য খুঁজে বেড়াচ্ছি আমরা?

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। রতন চোখে দুরবিন লাগিয়ে খুঁজতে লাগল লোক দুটোকে। হঠাৎ সে দূরবিন নামিয়ে কেমন উত্তেজিতভাবে বলল–চল ওপারে।

আড়চোখে চেয়ে দেখি তার চোয়াল শক্ত, চাহনি গম্ভীর। তার দৃষ্টি রয়েছে সোজা পাথরগুলোর দিকে, যেদিকে আমরা এখন চলেছি।

খাদ পেরিয়ে ওপারে সমতল জায়গাটায় পৌঁছুলাম। আর ক-ঘণ্টা মেয়াদ আমাদের। ঘড়িতে দেখি প্রায় এগারোটা বাজে।

প্রতাপ।

রতন আমার হাত চেপে ধরেছে। আমরা এখন একটা খোলা চত্বরের মতো জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি। চারদিকে কালচে পাথরের স্তর।

এগুলোই কি ক্রোম পাথর? আমি প্রশ্ন করলাম।

নিঃসন্দেহে। কিন্তু এটা কী?

কালচে ক্রোমের গায়ে গায়ে আর এক রকম পাথর। হালকা ছাই রঙের। রতন সেই পাথরের কয়েকটা টুকরো তুলে নিল।

এটাতে নিকেল আছে নাকি? আমি চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম।

আমার তাই বিশ্বাস।

আমি বললাম, তাহলে তো কেল্লাফতে। আর যদি নিকেল নাই বা থাকে অন্তত ক্রোম তো আবিষ্কার করা গেছে। তাই বা কম কী।

বটে ব্রাদার, এই মতলবে আসা হয়েছে তোমাদের? আর আমার কাছে সব চেপে যাওয়া হয়েছিল?

বোসদার গলা শুনে চমকাই। কখন যে তিনি আমাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন টের পাইনি। একটু অপ্রস্তুত হই। তারপর স্বীকার করি–হ্যাঁ এটাই আমাদের অভিযানের আসল উদ্দেশ্য। তবে কথাটা গোপন রেখেছিলাম বাধ্য হয়ে।

বোসদা রাগ দেখিয়ে বললেন, কেন, আমি জানলে কি তোমাদের গোপন কথা ফাস করে দিতাম। না ভয় ছিল আবিষ্কারটা আগে করে ফেলে ক্রেডিট নিয়ে নেব?

আমরা লজ্জিতভাবে মাথা চুলকোই।

যাক বোসদা সত্যি মোটেই রাগেননি। বরং খুশিতে উজ্জ্বল তাঁর মুখ। জায়গাটা ভালো করে দেখছি, হঠাৎ বোসদা বললেন কিন্তু এতেও কি নিকেল আছে ব্রাদার?

বোসদা কী যেন একটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়েছেন। তিনি সেটা দু-আঙুলে তুলে ধরলেন। একটা আধপোড়া চুরুট।

রতন একটা শুকনো হাসি হেসে বলল, যিনি পথের কাঁটা তদারক করতে এসেছিলেন, তিনিই ওটা ফেলে গেছেন।

এখান থেকে যে পাথর কেটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার প্রমাণ সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। বড় বড় এবড়ো-খেবড়ো গর্ত আর ইতস্তত ছড়ানো নুড়ি-পাথর।

আমি বললাম, একটা বেআইনি কারবারের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না রে রতন?

রতন মাথা নেড়ে সায় দিল। আমি বাজি ফেলতে পারি মিস্টার সিং বিনা লাইসেন্সে এখান থেকে ক্রোম পাথর সরাচ্ছেন। আজ গোপনে এসেছিলেন তার সাকরেদদের কাছে। বোধহয় আমরা কী করছি, তার খবর নিতে।

তাই সিং আমাদের তাড়াতে চাইছিল।

ন্যাচারেলি। পাগলা হাতির গল্পে কাজ হল না তাই তোক লাগিয়ে মৌচাকে ঢিল মেরেছিল। ওই বোধহয় ওপর থেকে পাথরটা গড়িয়ে দিয়েছিল আমাদের খতম করার মতলবে।

ইসস! বোসদা আক্ষেপ করে উঠলেন। সব শুনে-টুনে মনে হচ্ছে গুলিটা যদি অন্তত লোকটার ঠ্যাঙে-ট্যাঙে লাগতো তাহলে মন্দ হত না।

আমরা তিনজনে ফেরার পথ ধরলাম।

এবার খাদের কাছে এসে আবিষ্কার করলাম দিব্যি একটা সিঁড়ি নেমে গেছে নিচের দিকে। আমরা সিঁড়ি দিয়ে নামছি। এমন সময় হঠাৎ কানে এল এক অদ্ভুত শব্দ।

বোসদা থমকে থেমে ধরা গলায় বললেন, ভাই প্রতাপ–এ কান্না কাল রাতেও শুনেছি আমরা!

আমিও তাই ভাবছিলাম। ঠিক সেই একই অমানুষিক বীভৎস কান্নার শব্দ! কিন্তু এবার অনেক স্পষ্ট।

আমরা তিনজনে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পাথরের আড়াল থেকে রুদ্ধশ্বসে খাদের দিকে চেয়ে রইলাম।

.

০৬.

মনে হল কান্নার রব আসছে খাদের ওপারে কেল্লাপাহাড়ের গায়ে কোনো গুহার ভিতর থেকে। প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট গভীর খাদ দুই পাহাড়ের মাঝখানে। এই খাদের ওপরের দিকে কেল্লাপাহাড়ের গায়ে দু-তিনটে পাশাপাশি বড় বড় গুহা। গুহাগুলির সামনে খানিকটা বারান্দার মতো জায়গা। তারপরই খাদের ঢল নেমেছে খাড়াই। সবিস্ময়ে দেখলাম, একটা গুহার ভিতর থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে গলগল করে, আর সেই সঙ্গে কান্নার স্বর আরো বেড়ে গেল।

এবার হতভম্ব হয়ে দেখলাম, যে-গুহা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল, সেই গুহা থেকে বেরিয়ে এল এক কালো ভাল্লুক, আর তার পিছনে পিছনে দুটো ছানা। বাচ্চা দুটো তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। কী আশ্চর্য–এদের কান্নাই শোনাচ্ছে মানুষের মতো!

ভাল্লুক ফ্যামিলি আস্তে আস্তে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে গেল।

এবার ধোঁয়া একটু কমে এল। পরক্ষণেই সেই গুহার মুখে বন্দুক হাতে ডাকুর আবির্ভাব ঘটল। যেন ভোজবাজি। আমরা থ। ডাকু আমাদের দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে ডাকল–চলে আয়, কোনো ভয় নেই। ভাল্লুক পালিয়েছে।

সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে ঠিক অমনি আর একটা সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডাকুর কাছে পৌঁছলাম।

রতন বলল, কী ব্যাপার। এ সব কী?

ডাকু বলল, ব্যাপার অনেক। ভিতরে আয়, দেখতে পাবি।

এই গুহার ভিতর?

হ্যাঁ, তবে এটা সাধারণ গুহা নয়,সুড়ঙ্গ।

আমরা চারজনে সেই প্রায় অন্ধকার গুহার মধ্যে ঢুকলাম।

ঢকে বঝলাম গভীর গহ্বর। গুহার মুখে কতগুলো বড় বড় পাথর একটার ওপর একটা সাজানো। কিছু পাথর মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে আছে। ডাকু টর্চ জ্বালল। তারপর একটু এগিয়ে গিয়েই বলল, সাবধান। সামনে দেখ।তার টর্চের আলো মাটিতে শায়িত এক মনুষ্যদেহের ওপর পড়ল।

এক যুবকের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ।

ডাকু বলল–এই হচ্ছে পঞ্চা। মরেছে ভাল্লুকের হাতে।

বোসদা আমার গায়ে ঘেঁষে দাঁড়ালেন।

পঞ্চা গুহায় ঢুকেছিল কেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

এই গুহামুখ দিয়ে ঢোকেনি পঞ্চা। বলেছি তো এটা সুড়ঙ্গ। পঞ্চা সুড়ঙ্গের অন্য মুখ দিয়ে এসেছিল। সেই মুখটা হল আমাদের তাঁবুর সামনে, দুর্গ-বাড়ির ভিতরে।

তুই বঝেছিলি পঞ্চা এর মধ্যে ঢুকেছে? রতন বলল।

পঞ্চা কেল্লাপাহাড়ে এসেছে সেটা সন্দেহ করেছিলাম। তাই প্রাণপণে খুঁজছিলাম পাহাড়ের গোপন জায়গাগুলি। তারপর বোসদাই আমাকে আসল ক্লু-টা দিলেন!

আমি!-বোসদা বিস্ময়ে চেঁচিয়ে ওঠেন। বলছ কী ব্রাদার!

আরো বলছি, ডাকু বলে চলল, জগন্নাথপুরেই প্রহ্লাদের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছিলাম যে পঞ্চা হয়তো কেল্লাপাহাড়ে যেতে পারে লুকোতে। বংশীর সূত্রে এ কেল্লার অন্ধিসন্ধি পঞ্চার চেনা, সুতরাং লুকোবার পক্ষে আইডিয়াল জায়গা। তারপর কাল এই পাহাড়ে এসে পেলাম একটা খালি সিগারেটের প্যাকেট, ওই ব্রান্ডের প্যাকেট পড়ে থাকতে দেখেছি বংশীর বাড়ির উঠোনে। জেনেছিলাম পঞ্চার ওই সিগারেট। অতএব আমার ধারণা আরো দৃঢ় হল। আজ সকালে বোসদা বললেন তিনি রাত্তিরে অদ্ভুত কান্নার মতো শব্দ শুনেছেন। দুগর মধ্যে থেকে। তোরা চলে যেতেই কৌতূহলী হয়ে ঢুকলাম ওই ঘরগুলোর ভেতর। খানিক সন্ধান করতেই চোখে পড়ে গেল খোলা সুড়ঙ্গ-মুখ। ইনস্পেক্টরও বলেছেন পঞ্চা এদিকে এসেছে। অতএব প্রস্তুত হয়েই ঢুকলাম সুড়ঙ্গে। কান্নাটা ছিল ভাল্লকের, সেটা আগেই আন্দাজ করেছিলাম। খোলা সুড়ঙ্গ দিয়ে ভেসে এসেছিল আওয়াজ। সুড়ঙ্গের ভিতর আবিষ্কার করলাম ভাল্লুকের কীর্তি। তারপর ধোঁয়া দিয়ে ভাল্লুক তাড়ালাম।

আমাদের দৃষ্টি আবার চলে গেল পঞ্চার মৃতদেহের দিকে। কী ভয়ংকর! বলে উঠলেন বোসদা।

ভয়ংকর ছাড়াও অবিশ্যি এর আরেকটা দিক আছে।

ডাকুর কথাটা শুনে তার দিকে চাইতেই সে একটু হেসে পঞ্চার দেহ পাশ কাটিয়ে গুহার ভিতর খানিকটা ঢুকে গেল। তারপর একটা ফাটলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল। একটা মূর্তি। রতন আর আমার মুখ দিয়ে একসঙ্গে একটা কথা বেরিয়ে পড়ল–

দেববাড়ির বিগ্রহ!

ডাকু মাথা নাড়ল। পঞ্চা এটাই লুকোতে চেয়েছিল সুড়ঙ্গে। সে বোধহয় সুড়ঙ্গের এই মুখটা পাথর সাজিয়ে বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল। ভাল্লুক তখন ছিল না গুহাতে। তারপর বাসায় ফিরে ভাল্লুক অতর্কিতে পঞ্চাকে আক্রমণ করে। এই মূর্তি পেয়েছি অনেক ভিতর দিকে–সুড়ঙ্গের এক কুলুঙ্গিতে।

বিগ্রহ হাতে নিয়ে অবাক হয়ে পরীক্ষা করলাম আমরা। কিছু অলঙ্কার জোর করে খুলে নেওয়া হয়েছে বটে, তাতে মূর্তির কোনো ক্ষতি হয়নি। এই প্রাচীন কারুশিল্পের নমুনার দিকে অবাক হয়ে দেখছি, এমন সময় খেয়াল হল ডাকু বিড়বিড় করে কথা বলছে

ব্যবসা করব। একজন আমায় পার্টনার করবে বলেছে। জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে চালান দেবার ব্যবসা...আর মনের সুখে জঙ্গলে ঘুরব।

সত্যিই তো! ডাকু যে তিন হাজার টাকা পাচ্ছে সেটা খেয়াল হয়নি। আশ্চর্যভাবে ডাকুর একটা হিল্লে হয়ে গেল।

এবার তোমার ক্রোম আবিষ্কারের কথাটা ডাকুকে বলে দাও, বোসদা রতনকে বললেন।

তুই ক্রোম পেয়েছিস? ডাকু উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠল। চল, বাইরে গিয়ে সব শুনব। এই অন্ধকারে আর ভালো লাগছে না।

শুধু তাই নয়, বোসদা বলে উঠলেন, বারোটা বাজে। মনে আছে, দুটোর মধ্যে পলাশবুনি পৌঁছবার কথা আমাদের?

ডাক আবার টর্চটা জ্বালল আমাদের পথ দেখাবার জন্য। আলো দেয়ালে পড়তেই আমার দৃষ্টি একটা জায়গায় আটকে গেল। কয়েকটা লাল রঙের রেখা।

ডাকুর হাত থেকে টর্চ নিয়ে দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেলাম।

পাথর মসৃণ করা হয়েছে। তার উপর সাধারণ রেখা নয়, রেখাচিত্র। এ তো আদিম মানবের হাতে আঁকা ছবি! ছবিগুলি ভালো বোঝা যাচ্ছিল না। বেশির ভাগই মুছে গেছে। একটিকে মনে হল মানুষ।

রতনরা অবাক হয়ে আমায় লক্ষ করছিল। ডাকু বলল–কী ব্যাপার?

বললাম, মনে হচ্ছে এ সব প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের আঁকা ছবি। এ গুহা নিশ্চয় খুব প্রাচীন। আদিম যুগে মানুষের বাস ছিল এ গুহায়।

ডাক বলল, হতে পারে। এ অংশটা ন্যাচারাল কেভ্। প্রাচীন গুহা। তবে কিছুদুর গিয়ে গুহাটা মানুষের তৈরি এক সুড়ঙ্গে পরিণত হয়েছে। কেল্লা থেকে গোপনে বেরিয়ে আসার জন্যে এই সুড়ঙ্গের সৃষ্টি।

আমি বেরিয়ে পাশের গুহাতে ঢুকলাম। হা ঠিক যা ভেবেছি। এ গুহার দেওয়ালেও অনেক রেখাচিত্র। লাল রঙে আঁকা। আঁচড় কেটে আঁকা। দুটো মানুষ এবং একটা শিংওলা পশুর ছবি। আর সন্দেহ নেই। এ সব প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহা-মানুষের শিল্পচর্চার নিদর্শন।

এরপর আমি খাদে নামলাম। ডাকু বন্দুক হাতে পাহারায় রইল ভাল্লুকের আশঙ্কায়। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে জানি, কিন্তু তাতে আমার ভ্রূক্ষেপ নেই। আবিষ্কারের নেশায় তখন আমার মাথা ভো ভো করছে।

বেশিক্ষণ খুঁজতে হয়নি। পনেরো মিনিটের মধ্যেই আমার প্রত্নতাত্ত্বিকের চোখ আবিষ্কার করল তিনটি বিচিত্র প্রস্তরখণ্ড, পাথরগুলির সামনের দিক ছুঁচলো পিছন দিক হাতলের মতো। যেন বড় ছোরা বা কুঠারের ফলা। এ বস্তু স্বাভাবিকভাবে হয়নি। মানুষের হাতে গড়া পাথুরে অস্ত্র। বৃষ্টির জলে ধুয়ে গুহা থেকে নিচে পড়েছে।

পাথুরে অস্ত্রগুলি হাতে নিয়ে উঠে এলাম। রতনকে বললাম, এই অস্ত্র বা গুহাটি পরীক্ষা করলে অভিজ্ঞ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা তাদের সময় স্থির করতে পারবেন। তবে আমার মনে হচ্ছে প্যালিওলিথিক যুগের শেষ ভাগ, অর্থাৎ প্রায় দশ থেকে চল্লিশ হাজার বছর আগেকার মানবগোষ্ঠীর চিহ্ন এগুলি। ভারতের অনেক জায়গায় এমনি অতি প্রাচীন গুহা-মানবের চিহ্ন আবিষ্কার হয়েছে। এই গুহাগুলোর মেঝে খুঁড়লে আরও বহু চিহ্ন পাওয়া যাবে।

আশ্চর্য হালকা ও উৎফুল্ল মন নিয়ে আমরা তাঁবুর দিকে রওনা দিলাম। অভিযান সার্থক। বিদায় কেল্লাপাহাড়! আর কখনো এখানে আসা হবে কিনা জানি না। যদিও আসার ইচ্ছে রইল। আসন্ন গ্রীষ্মের ছোঁয়াতে ডালে ডালে নবীন পাতার আবির্ভাব ঘটেছে। আবার বসন্তের রেশটুকুতে প্রকৃতি কী মধুর। এত কাণ্ড যে ঘটে, প্রকৃতি-রাজ্যে কোনো ক্ষেপ

নেই যেন। কে বলবে এই পাহাড়-জঙ্গলে মানব ইতিহাসের বিচিত্র সব পর্ব অভিনীত হয়েছে যুগ যুগান্তর ধরে। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা লোভ লালসায় প্রকৃতি সর্বদাই বুঝি এমনিই নির্বিকার, উদাসীন!

.

পরদিন বিকেল। মিস্টার দত্তর বৈঠকখানায় চারজন জমায়েত হয়েছি। গতকাল ফিরে এসে প্রথমে এক চোট ধমকের পর আমাদের খবর শুনে যে ধরনের অভ্যর্থনা পেয়েছিলাম, তা অন্তত আমার ভাগ্যে আর কখনো জোটেনি। রতনের কাকা কাকিমা আমাদের অভিযানের সমস্ত বিবরণ খুঁটিয়ে শুনলেন। মিস্টার দত্ত দুর্গ ও সুড়ঙ্গ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করলেন। কাকিমার আগ্রহ দেখলাম সব চেয়ে বেশি সেই ভয়ংকর শঙ্খচূড় সাপটা সম্বন্ধে। রাতের বেলায় সেই রহস্যময় শব্দ অর্থাৎ ভাল্লুকের কান্নার কথা শুনে তিনি বড় বড় চোখ করে বললেন, কে জানে বাপু ওটা কীসের আওয়াজ ছিল। রাত্তিরে যে আবার বাহাদুরি করে দেখতে বেরোওনি তাই রক্ষে। যা ডানপিটে সব।

গতকাল ফেরার পথে রামচন্দ্রপুর থানায় থেমে দারোগাবাবুর হাতে বিগ্রহ সমর্পণ করে। তাকে ক্রোমের ব্যাপারটা জানিয়েছিলাম (নিকেল সম্বন্ধে অবিশ্যি কিছুই বলিনি)। চন্দ্রজিৎ সিং-এর কথা শুনে দারোগাবাবু স্পষ্টই বললেন যে ওই পাহাড়ে সিং-এর কোনো মাইনিং রাইট নেই, এবং এই বেআইনি কারবার তিনি অচিরেই ঘুচোবেন। বিগ্রহর ব্যাপারে এই

কিছুক্ষণ হল খবর এসেছে যে বাবু খগেশ্বর দেব দু-একদিনের মধ্যে নিজেই এসে ডাকর হাতে টাকাটা তুলে দেবেন।

আমরা চারজন গল্পগুজব করছি এমন সময় চাকর এসে খবর দিল যে রতনের ফোন এসেছে, ত্রিপাঠী সাহেবের কাছ থেকে। ফোন সেরে রতন একগাল হাসি নিয়ে ফিরে এসে বলল, পেয়েছে। ওই ছাইরঙা পাথরে নিকেল পেয়েছে ত্রিপাঠী।

আমি ও ডাকু লাফ দিয়ে উঠে রতনকে জড়িয়ে ধরলাম।

থ্রি চিয়ারস্ ফর দা হিরো! ডাকু চেঁচিয়ে উঠল।

রতন বলল, কেন বাপ, আমি একা কেন? তোরা দুজনই বা কীসে কম?

কথাটা খুব ভুল বলেনি রতন। ডাকু দেব-বাড়ির বিগ্রহ উদ্ধার করেছে, আর আমি প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবের গুহাগৃহ আবিষ্কার করেছি। সত্যিই। আমরা তিনজনেই তো হিরো।

বোসদা এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন, এবার শুনলাম তাঁর গলা খাক্রানি। কিছু বলবেন কি? আমরা তিনজনেই তার দিকে চাইলাম। কফির পেয়ালাটা হাত থেকে নামিয়ে রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে বোসদা গম্ভীর গলায় বললেন, আমার কথা ভুলে যেও না ব্রাদার।

আমিও যে একজন হিরো! অবিশ্যি তোমাদর বৌদির কাছে। কিন্তু তাঁর কাছে হিরো হওয়াটা যে কত বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট সে তো তোমরা বুঝবে না! আজ সকালেই বারো পাতার একখানা চিঠি দিয়েছি তাকে, আমাদের অ্যাডভেঞ্চারের বর্ণনা দিয়ে। আর বাকিটা শোনাব সামনের মাসে ছুটি নিয়ে বাড়ি গেলে।

রতন এবার জয়ধ্বনি দিল–থ্রি চিয়ারস ফর কেল্লাপাহাড়!

আমরা বাকি তিনজনে হুঙ্কার ছাড়লাম–হিপ হিপ হুর-রে!